ইচ্ছামতী

গ্রীষ্ম সংখ্যা ২০১১

সূচীপত্র

রথম পাতাঃগ্রীষ্ম সংখ্যা ২০১১....................1

মজার পাতা....................6

ছড়া-কবিতা....................8

হ্যালো বাঘ মামা....................8

রবি-শশী....................10

মেঘ স্বপনের দেশে 12

আফগানী চিংড়ির ঝোল....................13

দেখেই এসো নিজে....................14

গল্প-স্বল্প....................15

ভূত বন্ধু....................15

কুটুস ও ভিখারী....................24

বিদেশী রূপকথা: ছোট্ট ইডার ফুল গুলি....................31

পড়ে পাওয়া: বনের খবর....................38

পুরাণকথা: দিনেওয়ান আর গুম্বলগাবন....................40

স্বাধীনতার গল্প: পর্ব ৩....................44

শিল্পের ইউরোপ: পর্ব ৩....................47

বায়োস্কোপের বারোকথা: সিনেমা জগতের নতুন অভিজ্ঞতা....................54

ছবির খবর: ট্যাঙ্গেল্‌ড্‌....................57

দেশে-বিদেশে....................62

বসন্ত তার গান লিখে যায়....................62

গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে কিছুক্ষণ....................71

পরশমণি: গরম ঠান্ডা নিয়ে দু'চার কথা....................75

জানা-অজানা: গের....................78

এক্কা-দোক্কা....................82

বিশ্বজয়ী ভারত....................82

ডার্বির হাল-হকিকত....................86

আঁকিবুকি....................91

<u>রথম পাতাঃগ্রীষ্ম সংখ্যা ২০১১</u>

দিব্যি ঘুমাচ্ছিলাম আমি আর ইচ্ছামতী। ভোরবেলা বোজা চোখ যেন আর খুলতেই ইচ্ছা করছিল না। কিন্তু খুলতে হল। না খুলে উপায় আছে? জানালা দিয়ে চোখে এসে সোজা বিঁধছে ভোরের প্রথম আলো। সূয্যিমামাতো সেই কোন কাকভোরে উঠে পূবসাগরে ডুব দিয়ে নেয়ে ধুয়ে সাতসকালে আকাশে উঠে বসে আছেন। আর বসবেন নাই বা কেন? এসে গেছে গ্রীষ্মকাল। এখন তো দিন ক্রমশঃ বড় হবে আর রাত ক্রমে ছোট, তাই সূয্যিমামার কাজের সময়ও বেশি। সেই যে গত সংখ্যায় বলেছিলাম শীতবুড়োর কথা, সে তো পিঠে পায়েস খেয়ে, কম্বলখানি গায়ে জড়িয়ে কবেই আবার উত্তরমুখো হাঁটা দিয়েছে। তারপরে এল বসন্ত। তবে সে বড় চঞ্চল। এসেছে কি না এসেছে, ভাল করে বুঝে ওঠার আগেই সে সরস্বতী পুজো আর দোলের রঙখেলার খুশি ছড়িয়ে দিয়ে তড়িঘড়ি বিদায় নিল। যেতে যেতে অবশ্য তার কাজ সেরে গেছে - গাছে গাছে নতুন কচি সবুজ পাতা, আর নীল আকাশের কোল সাজিয়ে গেছে লাল কৃষ্ণচূড়া, হলুদ রাধাচূড়া, বেগুনী আকাশমণি, আর কমলা পলাশফুলে। আর বসন্ত যেতেই এসে গেল গ্রীষ্ম। এখন খালি গরম বাড়বে আর বাড়বে। সারা দিন ঝলসে যাবে সূর্যের প্রখর তাপে, কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় তিনি যখন কাজ শেষ করে দিনের মত বিশ্রাম নিতে যান, তখন, দখিণ দিক থেকে ভেসে আসে ঠাণ্ডা বাতাস। সারাদিনের পরিশ্রমের পর শীতল করে সবাইকে।

মাঝে মাঝে আকাশ কালো করে ধেয়ে আসছে কালবৈশাখী। জোরালো বাতাস আর ঝমঝমে বৃষ্টির পরশে ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছে সব উষ্ণতা। সেই ঝড়ে আমের ডাল থেকে খসে পড়ছে ছোট ছোট কুসি। সেই টকটক পুঁচকে পুঁচকে আম ছাড়িয়ে নুন মাখিয়ে খেতে যা ভাল না ... কি আর বলব তোমায়!

বেশ কয়েক বছর পরে এবার প্রায় দুয়েক দিন পরে পরেই কালবৈশাখী হচ্ছে। প্রকৃতি মা যেমন

একদিকে খুব গরমে কষ্ট দিচ্ছেন, অন্যদিকে আবার মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা করেও দিচ্ছেন। বিশ্বের সব মায়ের সেরা মা হলেন প্রকৃতি। দেখ, ঋতু পরিবর্তন করে গরম নিয়ে এলেন ঠিকই, কিন্তু সাথে নিয়ে আসছেন কত ভাল ভাল উপহারও - গ্রীষ্মকাল মানেই তো নানারকমের রসালো, ঠাণ্ডা, মিষ্টি ফলের সময় - আম, তরমুজ, জামরুল, লিচু, কাঁঠাল...কোনটা ছেড়ে কোনটা খাই...এই সময়েই ফোটে নানারকমের সুগন্ধী ফুল, সন্ধ্যাবেলা যাদের মধুর সুবাসে মন ভাল হয়ে যায়। আর প্রকৃতিকে যিনি এতরকম উপাদানে সাজিয়ে তুলেছেন, তিনি হলেন ধরিত্রী - আমাদের পৃথিবী। আমাদের জন্য এত ভাবনা চিন্তা করেন যিনি, সেই ধরিত্রী মাকে তো তাহলে একটা দিন অন্ততঃ বিশেষ ভাবে আদর যত্ন করতেই হয়, তাই না? সেই কারণেই গত ২২শে এপ্রিল পালিত হল 'ইন্টারন্যাশ্নাল মাদার আর্থ ডে'। প্রতি বছর এই দিনে পৃথিবীর নানা দেশে নানারকমে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পৃথিবীর সম্পর্কে, প্রকৃতির সম্পর্কে সাধারন মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়িয়ে তোলা হয়। ধরিত্রীকে ভালবাসলে তিনিও আমাদের ভালবাসবেন। তাঁর মত সহনশীলা মা আর কেউ নেই। মানুষের সমস্ত অত্যাচার তিনি হাসিমুখে মেনে নেন, ঠিক যেমন তোমার প্রায় সব দুষ্টুমিকেই মেনে নেন তোমার মা।

কিন্তু মা যদি কোন কারণে রেগে যান? তাহলে কি হবে? তাহলে কি হতে পারে, সেটা আমরা দেখেছি গত ১১ই মার্চ, যেদিন বিশ্বের এক ছোট্ট কিন্তু খুব উন্নত দেশ জাপানে হল ভয়ানক ভূমিকম্প, আর তার পিছে পিছে জলদস্যুর মত ধেয়ে এল সুনামি। জাপান প্রযুক্তিবিদ্যা আর কারিগরী দক্ষতায় বিশ্বের সেরা দেশগুলির মধ্যে একটি। জাপানিদের সবাই চেনে এক নিয়মানুবর্তী, শৃঙ্খলাপরায়ণ জাতি রূপে। কিন্তু এই মানুষগুলিও কত অসহায় হয়ে পড়লেন, যখন তাঁদের দেশ কেঁপে উঠল প্রবল ভূমিকম্পে, দুলে উঠল বাড়িঘর, ভেসে গেল একেকটা পুরো শহর। সেখানেই শেষ নয়। তাঁদের এক পরমাণুকেন্দ্রে চরম ক্ষতি হল। পরমাণুশক্তির তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়েছে তাঁদের আকাশে, বাতাসে, সমুদ্রের জলে, খাবারে। আমরা টেলিভিশনের পর্দায় দেখলাম আর মনে মনে বুঝতে পারলাম, যতই উন্নত হোক না কেন, প্রকৃতির রুদ্র রূপের সামনে আসলে মানুষ কত অসহায়। তুমিও নিশ্চই দেখেছ...অথবা খবরের কাগজে পড়েছ? আমরা শুধুমাত্র সবাই মিলে প্রার্থনাই করতে পারি যেন এইরকম ক্ষতি আর কারো না হয়, তাই না?

ভূমিকম্পের পরে জাপান

তবে আমি জানি, ইচ্ছামতীও জানে, আর তুমিও জান, যতই কষ্ট আসুক না কেন, আমাদের সবার শুভেচ্ছার জোরে জাপানের মানুষ আবার নিজেদের দেশকে গড়ে তুলবেন ঠিক আগের মত করে। অনেক কিছু নষ্ট হয়েছে, অনেক মানুষ তাঁদের আত্মীয় পরিজনদের হারিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা ভেঙ্গে পড়বেন না। তাঁরা আবার গড়ে তুলবেন তাঁদের দেশকে। সমস্ত রকমের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই করে জিতে যাওয়ার ইচ্ছা থাকে সবারই মধ্যে। আর যদি সত্যি সত্যি জিতে যেতে পার, তাহলে কেমন লাগে?

কেমন যে লাগে, সেটা এবার ২০১১ এর ক্রিকেট বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় যারা ভারতকে সমর্থন করেছিল তারা সবাই জানে। দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে, প্রতি চার বছর অন্তর লড়াই চালিয়ে গেছেন ভারতের ক্রিকেট দল। অনেকবারেই শেষ ধাপের কাছাকাছি এসে ফিরে যেতে হয়েছে হতাশ হয়ে। কিন্তু তাতেও তাঁরা হাল ছাড়েননি। প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা কিন্তু খুব সহজে নিতে দেয়নি বিশ্বকাপ। তারা শেষ মূহুর্ত অবধি কঠিণ লড়াই চালিয়ে গেছে। কিন্তু ভারতীয় দল ফাইনাল ম্যাচের দিনে দেখিয়ে দিলেন, নিষ্ঠা, পরিশ্রম আর ইচ্ছাশক্তি থাকলে মানুষ অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও জিতে বেরিয়ে আসতে পারে। তুমিও নিশ্চয় দেখেছিলে সেই খেলা? ভারত বা শ্রীলঙ্কা, অথবা অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, বাংলাদেশ বা আয়ারল্যান্ড - যাকেই সমর্থন করে থাক না কেন, একটা কথা আমাদের সবার সবসময়ে মাথায় রাখা উচিত - একটা সুস্থ খেলার আনন্দ যেন নিছক রেষারেষিতে না বদলে যায়। প্রথম পুরষ্কারটা তো যেকোন একজন নিয়ে যাবেই, কিন্তু যারা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে, তারা কিন্তু সবাই একই রকম ভাবে পরিশ্রম করে জেতার জন্য। তাই হেরে গেলেও তাদেরকে জিতে যাওয়া দলের মতই একই রকম সম্মান জানাতে হয়।

বিশ্বকাপ জেতার পরে টিম ইন্ডিয়া

তুমি কি ক্রিকেট খেল? অথবা ফুটবল? বা কবাডি, খো খো অথবা কুমির ডাঙ্গা? ভাবছ, এত খেলার কথা উঠছে কেন? আরে, সামনেই তো স্কুলের গরমের ছুটি! আর ছুটি মানেই তো খেলাধুলো করার অফুরন্ত সময়, তাই না? তার মানে কিন্তু এই নয় যে পড়াশোনা বন্ধ - পড়াশোনা আর অন্যান্য নিয়মিত কাজকর্ম, যেমন আঁকা বা গান, নাচ অথবা সাঁতার, সব কিন্তু নিয়মমাফিক করে যেতে হবে। তার ফাঁকে ফাঁকে চলবে খেলাধুলো। আর সামনের কয়েকদিনের মধ্যেই রয়েছে কয়েকজন শ্রদ্ধেয় মানুষের জন্মতিথি। ২৫শে বৈশাখ হল রবি ঠাকুরের জন্মদিন, আর ১১ই জৈষ্ঠ হল আমাদের আরেক প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন। এঁদের আগে অবশ্য থাকছে আমাদের আরেক মনের মানুষের জন্মদিন - আজ, ২রা মে হল সত্যজিত রায়ের জন্মদিন। এই দিন গুলিতে এঁদেরকে শ্রদ্ধা জানাতে ভুলো না কিন্তু।

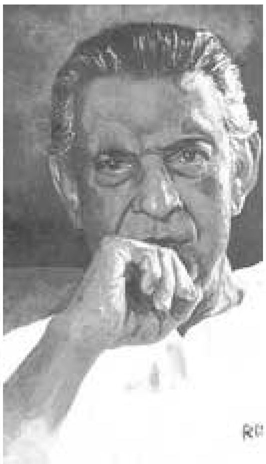

আর এইসব নানান কাজ কর্মের মধ্যে, তোমার সঙ্গে অবশ্যই থাকছে ২০১১ সালের ইচ্ছামতীর নতুন গ্রীষ্ম সংখ্যা। নানা রকমের গল্প, ছড়া আর অন্যান্য নিয়মিত লেখা নিয়ে এবারেও বেশ সেজেগুজে এসেছে ইচ্ছামতী। সব পাতাগুলিকে একবার করে খুলেই দেখ না কেন!

সব শেষে তোমাকে আর তোমার পরিবারের সকলকে জানাই নতুন বাংলা বছর ১৪১৮ এর শুভেচ্ছা। আশা করছি ১লা বৈশাখ সবার খুব ভাল কেটেছে। বৈশাখ মাস যদিও শেষ হতে চলল, কিন্তু নতুন বাংলা বছরে আমাদের তো এই প্রথমবার কথা হচ্ছে, তাই আমরা তো বলতেই পারি 'শুভ নববর্ষ', তাই না?

খুব ভাল থেক। তোমার নতুন বছর খুব ভাল কাটুক। এই গ্রীষ্মের ছুটিতে আমের আচার আর তরমুজের শরবতের সাথে তোমার সঙ্গী করে নাও নতুন ইচ্ছামতীকে। আর আমাকে অবশ্যই লিখে জানিও কেমন লাগছে ইচ্ছামতী।

চাঁদের বুড়ি

সোমবার,
১৮ই বৈশাখ, ১৪১৮
২রা মে, ২০১১

মজার পাতা

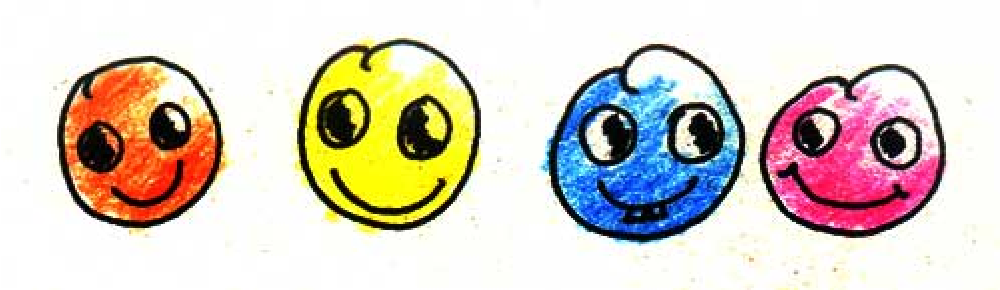

বল তো দেখি কী?

১.আদিবিহনে সমূহ,অন্তহীনে যাবে বাদ,
তিনে মিলে তৃষিতের, পূর্ণ করি সাধ।

২. চল যাই আগেপিছে, অস্থির হইয়া,
মাথাহীন অন্চলেরে,সঙ্গেতে লইয়া।

৩. চার অক্ষরে নাম তার,মাঝের দু' অক্ষর বাদে,
রঙের নামই বোঝাবে ভাই, যতই পড় ফাঁদে,
পার্বত্য অন্চল ঘোর বিপদ সঙ্কুল,
বেজেছিল রণডঙ্কা, কি নাম তা বল।

৪. চমকিয়া উঠিও না, অর্দ্ধ করো ত্যাগ,
আবৃত্তি করিয়া তারে, লও মিষ্টান্নের ভাগ।

৫. অর্ধভাগে জনগণ, শেষেতে মালিক,
সুন্দর পতঙ্গ চারে, সৃষ্টির প্রতীক।

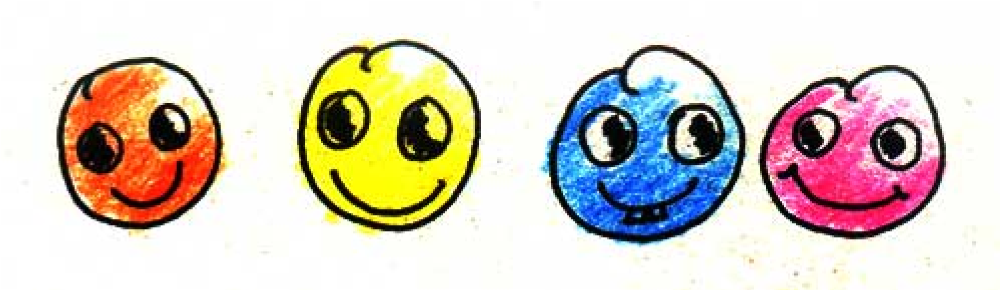

উত্তরমালা:

১. বাদল।

২. চন্চল।

৩. কারগিল।

৪. চমচম।

৫. প্রজাপতি।

ডঃ জি. সি. ভট্টাচার্য্য,
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়
বারানসী, উত্তর প্রদেশ

ছড়া-কবিতা

হ্যালো বাঘ মামা

শুনতে পেলুম হালুম হুলুম
সোঁদর বনের মামা
গায়ে হলদে কালো ডোরাকাটা
হাল ফ্যাশানের জামা
গত চারমাস ধরেই আছেন
চিড়িয়াখানায় বন্দী
প্রান যায়যায় গরম বেজায়
তাই তো আঁটেন ফন্দী
কত কাঁদাকাঁদি কত সাধাসাধি
হল না যে কোনো কাজই
চিড়িয়াখানার লোকগুলো
ভারী পাজি

সোঁদর বনের মধুর ছায়া ছেড়ে
এই কোলাহলে কোলকাতা আসে কেরে?
হায় মামা বড় ফ্যাসাদে
লোহা দিয়ে গড়া প্রাসাদে
হ্যালো বাঘমামা বললেই যান তেড়ে।

দ্বৈতা গোস্বামী
গুরগাঁও, হরিয়ানা

রবি-শশী

একই মায়ের দুইটি ছেলে
একটি বড় শান্ত
আরেকটিরই মেজাজ চড়া
বদ্‌রাগি দুর্দান্ত।
একটি যদি দিনে ঘোরে
আরেকটি যে রাতে
দুজনেতে ঝগড়া ভীষণ
থাকে না একসাথে।
একটি যদি পুবে ওঠে
আরেকটি পশ্চিমে
একটি যদি রোদে পোড়ায়
একটি ভাসায় হিমে।

একটিজনের বিদায় হলে
অন্যজনে আসে
কেউ যদি বা দুঃখে পড়ে
অন্যজনে হাসে।
গরমিলেতেও একটি মিলই
আছে দুজনাতে
নিয়মমাফিক কাজটি করে
সমান দিন ও রাতে।
রক্তচক্ষু বদমেজাজি
রবি নামেই চেনা
ধীরস্বভাবের শশীবাবু
তা না জানে কে না!

জামাল ভড়
বারাসাত, উত্তর চব্বিশ পরগনা

মেঘ স্বপনের দেশে

ছাতের ধারে বিকেল বেলায় আকাশপারে চোখ
লালের ঝালর ক্যানভাসে তার আঁকছে অচিন লোক

দিগন জোড়া আগুন আর আলোয় মোড়া তুলি
নীড়মুখী সব পাখির ডানায় ছড়ানো রঙ গুলি

মায়ার তুলি রাঙিয়ে বেড়ায় মেঘের কোণে কোণে
কালচে ধূসর ক্যানভাসে ওই লালচে স্বপন বোনে

স্বপন ছড়ায় দূর আঙিনায় ছড়ায় মাঝির হালে
ছড়ায় যেথায় মেঘ শিশুরা খেলছে মায়ের কোলে

স্বপন দ্যাখে মেঘমেয়ে ওই হাওয়ায় ওড়ে কেশ
তুলির মায়া রাঙায় সারা মেঘ পাগলের দেশ

মায়াতুলির জিয়ন কাঠি রঙ ছড়াল যেই
কত না ফুল সুবাস ছড়ায় অচিন দেশে সেই

মেঘজোয়ান ওই বাজায় বাঁশি মেঘবৃক্ষের ছায়ে
মেঘযুবতীর আঁচল ওড়ে মেঘমাঝি দের নায়ে

মেঘমাঝি তার নাউ বেয়ে যায় লাল সূরযের দেশে
সাঁঝকন্যে কাঁকই করে, মেঘ স্বপন মনে ভাসে।।

শাশ্বত কর
কলকাতা

আফগানী চিংড়ির ঝোল

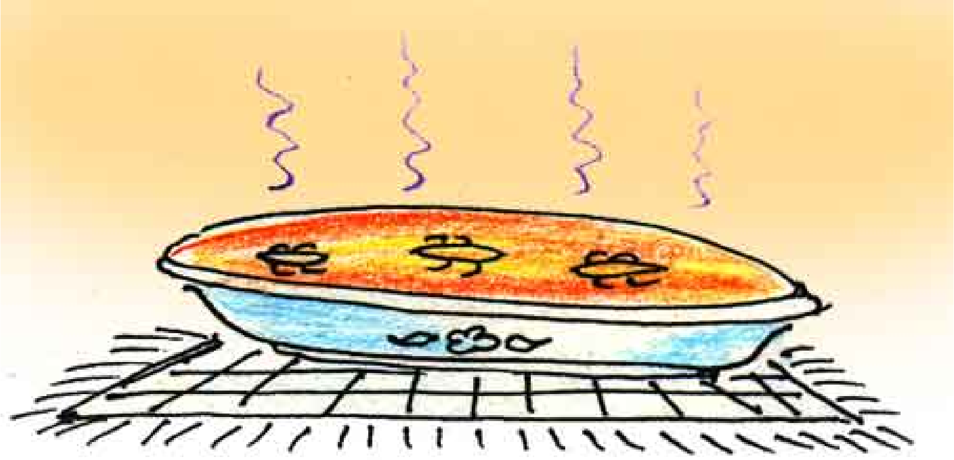

"গা করে ঘিন ঘিন,
পেট ওঠে গুলিয়ে
রাঁধুনিকে ধরে আন!
কান দেব পেঁচিয়ে!"
হাঁকে ডাকে রাঙাপিসি,
বাধে বুঝি মহাগোল!
"আরশোলা কেন পাতে?
চেয়েছি চিংড়ির ঝোল!"

হাত-জোরে অনুরোধ
অমায়িক রাঁধুনি,
"গলাটি চড়াবেন না,
দোহাই দিদি-মণি।
ফ্যাসাদে পরবো আমী,
হলে পরে জানাজানি।
খেতে ভারি কুড়মুড়ে!
জাতে ওটা আফগানী।
চাহিদা ভীষণ তাই,
সকলে যদি চায়,
অতগুলো আরশোলা,
বলুন কোথায় পাই?"

শিব শঙ্কর বসু
এপেক্স, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

দেখেই এসো নিজে

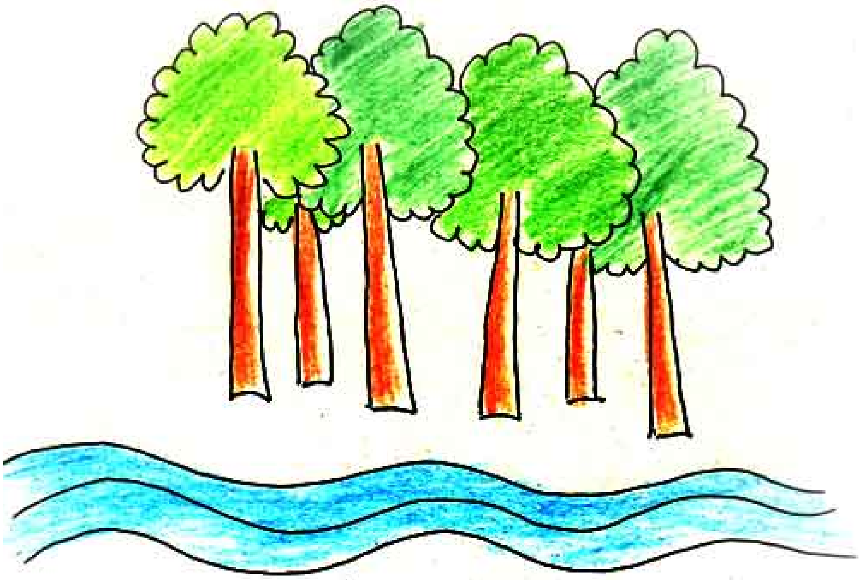

মাঠ পেরোলেই বন
সেখানেতে হারিয়ে যেতে
চায় কি তোমার মন?

বন পেরিয়ে যদি
খুশিতে পা ফেলতে পার,
হাতছানি দেয় নদী।

নদীর পরেই সাগর
দুষ্টু মেয়ের মতন যেন,
চোখটা ডাগর ডাগর।

সাগর শেষে পাহাড়
তোমার কথাই ভাবছে বসে,
ঘুম চোখে নেই তাহার।

পাহাড় শেষে কী যে,
অতশত জানিনা ভাই,
দেখেই এসো নিজে।।

সুনির্মল চক্রবর্তী
প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক সুনির্মল চক্রবর্তী তাঁর এই ছড়াটি ইচ্ছামতীতে প্রকাশিত হবার অনুমতি দিয়েছেন। এই ছড়াটি পূর্বে অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছে। মূল বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

গল্প-স্বল্প

ভূত বন্ধু

ভূত ব্যাপারটা কি তোমরা বিশ্বাস করো? ভূত বলে কি কিছু একটা আছে? ছোটবেলায় তো কত রকমের ভূতের গল্প পড়েছ - মা ঠাকুমার কাছে নানা ধরনের গা ছমছম করা ভূতের গল্প শুনেছ। আর গ্রামের ছেলে হলে তো কথাই নেই - ঘরের কিংবা বাড়ির আনাচে কানাচে, বাগানে, সন্ধ্যে হলেই অনেক ছায়া ছায়া ভূতকে ঘুরতেও দেখেছ - তাই না? আমাদের ছোটবেলায় তো আমরা অনেক রকম ভূতকে জানতাম, যেমন ধরো - ব্রহ্মদত্যি বেল গাছের ডালে খড়ম পায়ে উবু হয়ে বসে গুড়ুক গুড়ুক করে খেলো হুঁকোতে তামাক খায় - ইয়া বড় বড় দাঁত - গলায় মোটা পৈতে - মাথার লম্বা টিকিতে গাঁদা ফুল ঝুলছে; রোগা সিড়িঙ্গে গেছো ভূত সড়াৎ করে সুপুরি গাছের মাথায় উঠে মেজাজে পা দোলায় আর গাছের নিচে দিয়ে রাত্রে কেউ গেলেই পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের ফাঁকে চেপে ধরে; একানড়ে তাল গাছের মত খাড়া আর এক ঠেঙ্গা লম্বা - এক মাথা ঝাকড়া চুল - কপালের মাঝখানে একটাই

গোল চোখ অন্ধকারে ধক ধক করে জ্বলে; শাকচুন্নী লাল কালো চৌকো কাটা গামছা গায়ে বিল অথবা জলাতে লম্বা লম্বা পা ফেলে পুঁটি মাছ ধরে সেগুলোকে কাদায় পুতে রাখে পচা পুঁটি মাছ খাবে বলে; স্কন্ধকাটার মাথা নেই – চোখ দুটো বুকের মধ্যে – সন্ধ্যের পর যখন তখন বাঁশবনের ধারের রাস্তা দিয়ে দৌড়ায় বাচ্চাদের ধরার জন্য; মামদো ভূত আধো অন্ধকারে লোক জনকে উটকো ভয় দেখিয়ে আনন্দে মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে বিটকেল আওয়াজে হাসতে থাকে; পেত্নী সন্ধ্যেবেলা বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরে থেকে থেকে খোনা গলায় পান্তাভাত খেতে চায়; আরো কত ধরনের ভূত আর এই ভূতেদের সংসারে ব্রহ্মদত্যি হলো সব থেকে সম্মানিত ভূত। তোমরা, আজকালকার কচি কাঁচারা, জানোও না বাঙ্গালী ভূত পরিবারের ইতিহাস – শুধু জানো বিদেশী ভূতেরা ঝুল ঝাড়নে চেপে ঘুরে বেড়ায়, নানা রকম চেহারাতে সবাইকে ভয় দেখায় আর নয়তো ছোট্ট সুন্দর ভূত ক্যাসপার বাচ্চাদের সাথে খেলতে আর মজা করতে ভালোবাসে – টিভিতে এই সব ভূতেদের গল্প কমিকই তো তোমরা দেখো। শহরে মাঝে মাঝে পড়ো বাড়িতে ভূতের খবর পাওয়া যায় কিন্তু একটু স্থিতু হবার আগেই প্রোমোটারের ভয়ে বেচারিদের পালিয়ে যেতে হয়। সত্যিই ভূতেদের দিনকাল আজকাল খুবই খারাপ যাচ্ছে – ওদের আর থাকার বিশেষ জায়গা নেই, ঘোরা ফেরা করার উপায় নেই। এই রকমই এক মনমরা ভূতের সাথে ঘটনা চক্রে আমার একবার দেখা হয়েছিলো – ওদের দুঃখের কথা শুনলে তোমাদেরও কষ্ট হবে।

আমার জীবনের প্রথম চাকরি ছিলো মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভের – নতুন বলে কোম্পানি শহরে জায়গা দেয় নি – পাঠিয়ে দিয়েছিলো গ্রামে গঞ্জে ডাক্তারদের ফ্রি স্যাম্পলের লোভ দেখিয়ে বিক্রী বাড়ানোর জন্য। বেশীর ভাগ জায়গাতেই যাতায়াতের জন্য সাইকেল রিক্সা আর না হলে ভ্যান রিক্সা। এই ভাবে ভবঘুরের মত ঘুরতে ঘুরতে একটা গঞ্জে এসে হাজির হয়েছিলাম। রাতে থাকার মত হোটেল বলতে তেমন কিছু নেই – এক খাবার হোটেলে অনুরোধ করতে ওরা দোতলার একটা ছোট্ট ঘর দেখিয়ে বললো, ঘরটা অনেক দিন ব্যবহার হয় নি – একটু ম্যানেজ করে নিতে হবে। পুরাতন খাড়া কাঠের সিঁড়ি – প্রতি ধাপেই ক্যাঁচ কোঁচ আওয়াজ করে। ওপরে গিয়ে দেখি ঘরটা অনেক দিন নয় বেশ কয়েক বছর বোধ হয় ব্যবহার হয় নি – চারদিক ধুলো আর মাকড়সার জালে ভরা। একটা নেওয়ারের খাট আর নড়বড়ে কাঠের টেবিল ও চেয়ার – দেওয়াল আলমারিটার একটা পাল্লা কব্জা থেকে খুলে ঝুলছে। ঘরে আলোর ব্যবস্থাও নেই – হ্যারিকেন জ্বালাতে হবে। এক রাতের মাথা গোঁজার জন্য ওখানেই যতটা সম্ভব ঝাড়া ঝাড়ি করে শোবার মত ব্যবস্থা করতে হলো। রাতে নিচের হোটেলে খেয়ে একটা হ্যারিকেন নিয়ে ওপরে এসে খুব সাবধানে চেয়ারটায় বসলাম যাতে ভেঙ্গে না যায়। হ্যারিকেনের আলোতে ঘরে আলো থেকে ছায়ার খেলাই বেশী। চুপচাপ বসে ভাবছিলাম কালকে কোনদিকে যাওয়া যায় হঠাৎ শুনি কোথা থেকে বাচ্চা কুকুরের কুঁই কুঁই-এর মত আওয়াজ আসছে – ভাবলাম কুকুরের বাচ্চাটা নিচে দোকানে না হলে রাস্তায় হবে। আওয়াজটাকে পাত্তা না দিয়ে আস্তে করে নেওয়ারের খাটে পা তুলে যতটা সম্ভব আরাম করে বসার চেষ্টা করতে চেয়ার ও খাট দুটোই মনে হলো একটু প্রতিবাদ করলো। এবার ওই কুঁই কুঁই আওয়াজটা একটু জোরেই এলো – কে যেন নাকি সুরে কাঁদছে আর আওয়াজটা আসছে দেওয়াল আলমারির ভেতর থেকেই। এবার কৌতুহল মাথা চাড়া দিলো – তবে একটু ভয়ও হলো, কি জানি গ্রাম গঞ্জের ব্যাপার – কিসে থেকে কি হয়! হ্যারিকেনের আলোটা বাড়িয়ে দিয়ে জোরে গলা খ্যাঁকারি দিয়ে বললাম,

'কে রে ওখানে কুঁই কুঁই করে?'

সাথে সাথে কান্না থেমে গেলো, কে যেন কাঁপা কাঁপা খোনা গলায় বললো,

'আঁলোঁটাঁ কঁমিঁয়েঁ দাঁও – চোঁখেঁ লাঁগঁছেঁ – আঁমিঁ ভূঁতঁ।'

গলা শুনেই বুকের ভেতরটা ভয়ে গুড় গুড় করে উঠলো তবে বাইরে খুব সাহস দেখিয়ে রাগের ভান করে বললাম,

'তা আলমারির ভেতরে বসে কেঁদে যাচ্ছো কেন? জ্বালাতন করার আর জায়গা পেলে না? সারা দিন খেটে খুটে এসে একটু ঘুমাবো তারও উপায় নেই দেখছি।'

[এর পরে ভূতের কথা বার্তায় এত চন্দ্রবিন্দু দিলে ছাপাখানার অসুবিধা হবে – ওটা তোমরাই বসিয়ে নিও]

'এত বছর পর ঘরে আলো জ্বলতে দেখে ভাবলাম তুমি আমাকে ধরতে এসেছো – সেই ভয়ে আমার কান্না পেয়ে গেলো।'

'আমি জানতামই না তুমি এখানে আছো।'

'তুমি মনে হচ্ছে বাইরের লোক তাই বোধহয় জানো না। কিছুদিন হলো এক ওঝা এখানে এসে ভূত ধরার ব্যবসা শুরু করেছে – ধরতে পারলেই ভালো পয়সা। ও ব্যাটা কি করে যেন টের পায় কোথায় আমরা লুকিয়ে আছি। তারপর মন্ত্র পড়ে হাঁড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে মুখ বন্ধ করে খালের জলে ফেলে দেয়। আমি কোন রকমে পালিয়ে এই ঘরে আশ্রয় নিয়েছি – একটু যে বাইরের হাওয়ায় ঘুরবো তারও উপায় নেই। একা এই আলমারিতে থাকতে থাকতে মাঝে মাঝেই ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায়।'

'তা তুমি অন্য কোন জায়গায় পালিয়ে গেলে না কেন?'

'কোথায় যাবো বলো? আমাদের ভূতেদের সেই রবরবা তো আর নেই – এখন গ্রামে গঞ্জে সব জায়গায় ইলেকট্রিকের আলো জ্বলে – এত আলো আমাদের সহ্য হয় না। তাছাড়া এক কালে লোক জনকে ভয় দেখিয়ে বেশ আনন্দেই দিন কাটতো – এখন বাচ্চা ছেলে মেয়েরা পর্যন্ত ভূতের কথা শুনলে হাসে – কোন পাত্তাই দেয় না – আসলে ওরা তো বাঙ্গালী ভূতের কথা জানেই না। এ রকম নিরানন্দ ভূতের জীবন কি ভালো লাগে।'

'তা হলে আর কী করবে বলো। আপাততঃ তুমি আলমারির মধ্যে ঢুকে যাও। কালকে আমার অনেক কাজ – একটু ঘুমাতে দাও, কাল রাতে আবার কথা হবে। তবে কুঁই কুঁই করে একদম কাঁদবে না আর কোন রকম বদমাইসি করার চেষ্টাও করো না।'

পরেরে দিন এখানকার ডাক্তারদের পেছনে ঘুরেই সময় গেলো। এই সব গ্রাম গঞ্জের ডাক্তারদের মধ্যে কত জন সত্যিকারের ডাক্তার বলা মুস্কিল – নামের শেষে এক গাদা লেজুড় লাগিয়ে রেখেছে কিন্তু তা এ্যালোপ্যাথি না হোমিওপ্যাথি না আয়ুর্বেদিক কে জানে। সারাদিন ঘুরে ক্লান্ত হয়ে রাতের খাওয়া শেষ করেই ঘরে ফিরলাম। সারাদিনের চক্করে আর ডাক্তারদের সাথে ভ্যানর ভ্যানর করে ভূত ব্যাটার কথা মনেই ছিলো না। হাত মুখ ধুয়ে চেয়ারে আরাম করে বসতেই খেয়াল হলো বাবা জীবন তো ঘরেই আছেন।

'কৈ হে – কোথায় গেলে?'

'এই যে, আমি তোমার অপেক্ষাতেই আছি। কালকে তোমার সাথে কথা বলে খুব ভালো লেগেছে – অনেক দিন পর কথা বলার সঙ্গী পেলাম।'

'দ্যাখো বাবা, আমাকে আবার ভূত বানিয়ে দিও না।'

'কি যে বলো! সবাই বলে ভূতে ঘাড় মটকায় – আদপেই তা নয় – আমরা একটু ভয় টয় দেখাই এই পর্যন্ত। আমাদের দেখতে পায় না বলেই লোকে এত ভয় পায়। তা ছাড়া বদনামটা হয়েছে শুধু এই ছিঁচকেমি আর পেছনে লাগার জন্যই।'

'আমি কিন্তু কালকে ভোরে উঠেই ভোঁ কাট্টা - একটু দূরের একটা শহরে যেতে হবে। আমার কাজই এই – সারা বছর ঘুরে বেড়ানোর – কোথাও একটু স্থিতু হয়ে বসার উপায় নেই। তুমি তো এই ঘরেই থেকে যাবে, তাই না?'

'কালকেই চলে যাবে? আবার একা একা মনমরা হয়ে আলমারিতে পড়ে থাকতে হবে। তারপর কোন দিন ওঝা ব্যাটা টের পেয়ে আমাকেও হাড়িতে ঢুকিয়ে থালে ফেলে দেবে – ও তো ভূত ধরার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। (একটু চিন্তা করে) আমাকে একটু সাহায্য করবে?'

'বলে ফ্যালো – পারলে করবো।'

'আমাকে নিয়ে চলো না তোমার সাথে। তুমি তো একা একাই ঘোরো – গল্প টল্প করতে পারবে অবসর সময়ে – আমিও ওঝার হাত থেকে বেঁচে যাবো। তোমার ওই ঝোলা ব্যাগের মধ্যেই ঢুকে যাবো – কেউ টেরও পাবে না।'

'হ্যাঃ, আমি সারা জীবন একটা ভূতকে ঘাড়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াই। টের পেলে জনতা তো আমাকে পিটিয়ে ভূত বানিয়ে ছাড়বে।'

'না না, আমি কথা দিচ্ছি কেউ টেরই পাবে না। আর সুবিধে মত জায়গা পেলে আমি নিজেই চলে যাবো।'

'বুঝলাম - এতে তোমার তো জান বাঁচবে - কিন্তু আমার কি লাভটা হলো?'

'দ্যাখো, আমরা একেবারে ফ্যালনা নই – আমাদেরও কিছু কিছু গুণ আছে। আমি হয়তো তোমার সাহায্যও করতে পারি – তাছাড়া পাহারাদারের কাজও করবো। কথা দিচ্ছি কোন রকম নষ্টামি করবো না – আমাদের কথা কিন্তু খুব পাক্কা।'

ভূতের কথাটা মনে ধরলো – একটু মজাও লাগছিলো একটা সত্যিকারের ভূতকে ব্যাগের মধ্যে নিয়ে ঘুরে বেড়াবো বলে – তাছাড়া আমার তো কোন অসুবিধা হচ্ছে না ওকে নিয়ে ঘুরতে। এতে ওর যদি কোন উপকার হয় তো ভালোই। যেখানে সুবিধা মত জায়গা পাবো সেখানে না হয় ছেড়ে দেবো।
'ঠিক আছে, তুমি আমার ঝোলা ব্যাগটাতে ঢুকে যাও – তারপর দেখা যাবে কি হয়। তবে বুঝবো কি করে তুমি ব্যাগে আছো কি না?'

'তুমি ব্যাগের ওপর টোকা মারলেই আমি তোমার হাতে টোকা দেবো।'

সকালে উঠে চা টা খেয়ে ব্যাগটা ঘাড়ে নিলাম তারপর আস্তে টোকা দিতে আমার হাতেও টোকা লাগলো। একটা সাইকেল রিক্সা ধরে বাস ষ্ট্যান্ডে এসে একটু ছায়া দেখে দাঁড়ালাম বাসের জন্য। বুঝি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম হঠাৎ ভূত বললো,

'বাস আসছে, তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাও – বসার জায়গা পাবে।'

খেয়াল করি নি যে বাস আসছে – তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বাসে উঠে বসার জায়গাও পেয়ে গেলাম – না হলে কম পক্ষে ঘন্টা দুয়েক দাঁড়াতে হতো। ধীরে ধীরে ভূতের সাথে বন্ধুত্ব হয়ে গেলো। একা একা থাকার বিরক্তিটা আর ছিলো না – বিশেষ করে রাত্রে বেশ গল্প করেই সময় কেটে যেতো। হিসেব করে দেখলাম ওর মানুষ আর ভূত জীবন মিলিয়ে বয়সে প্রায় আমার সমানই। এর মধ্যে দুবার আমাকে খুব বাঁচিয়েও দিয়েছে। একবার রাস্তা পেরুবার সময় খেয়াল করি নি উলটো দিক থেকে আসা একটা ট্রাককে – ভূত না বললে ধাক্কা খেয়ে হাসপাতালে যেতে হতো। আর একবার গ্রামের আধো অন্ধকার রাস্তায় হাঁটার সময় দেখতে পাই নি কাল কেউটে সাপটাকে ঝোপের পাশে – একটু হলেই লেজে পা পড়তো। হঠাৎ দেখি সাপটা আমার সামনে হাওয়াতে দোল খাচ্ছে – ভূত ওটার লেজ ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো দূরে। এর কিছুদিন পরে হঠাৎই হেড অফিস থেকে চিঠি – ভয়ে ভয়ে খুললাম – কি জানি চাকরি থেকে ছাঁটাই করে দিলো কি না। দেখি কোম্পানির মার্কেটিং ম্যানেজার আমার কাজের প্রশংসা করে জানিয়েছেন আমার প্রমোশনের কথা। আর গ্রামে গঞ্জে ঘুরতে হবে না – শহরের অফিসেই বসতে হবে তবে খোদ কলকাতাতে নয় – একটা মাঝামাঝি ধরনের মফস্বল শহরে। ভূতকে রাত্রে বললাম, 'তোমার জন্যই হয়তো আমার কপাল ফিরেছে না হলে এত তাড়াতাড়ি কাউকেই প্রমোশন দেয় না। এবার আমাকে শহরের অফিসেই বসতে হবে।'

ভূতের মনে হলো মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেলো।

'বন্ধু, এবার আমাকে কোথাও ছেড়ে এসো। শহরের আলো আর ভিড়ে তো আমি থাকতে পারবো না।' ভূত যে চলে যাবে এটা আমার মাথাতেই ছিলো না – ও আমার প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী হয়ে গিয়েছে – মনটা খুব খারাপ হয়ে গেলো। তারপর ভাবলাম ওই মফস্বল শহরে তো কলকাতার মত আলো, ভিড় ভাট্টা নেই তাহলে ভূত বন্ধু কেন থাকতে পারবে না।

'দ্যাখো, আমার মনে হয় তুমি আপাততঃ আমার সাথেই চলো – ওখানে সত্যিই যদি তোমার ভালো না লাগে তা হলে না হয় তোমাকে অন্য কোথাও ছেড়ে আসার কথা ভাববো। আসলে কি জানো, আমাদের প্রায় বছর খানেকের এই মেলা মেশাতে তুমি আমার খুব কাছের লোক হয়ে গিয়েছো – তোমার সাথে গল্প করে সন্ধ্যেবেলা গুলো বেশ ভালোই কেটে যায় তার ওপর তুমি তো আমাকে অনেক ভাবেই সাহায্য করেছো তাই তোমাকে ছেড়ে থাকতে আমার ঠিক মন চাইছে না।'

'আমারও তাই – তোমাকে ছেড়ে কি ভাবে আবার একা একা থাকবো সেটাই চিন্তা করছিলাম। ওই শহরে অন্য কোন ওঝার দৌরাত্ম্য মনে হয় থাকবে না তাই একটু স্বাধীন ভাবেই থাকতে পারবো। ঠিক আছে চলো শহরে গিয়েই দেখা যাক।'

মফস্বল শহরটা খুব একটা বড় নয় – হাজার পঞ্চাশেকের মত লোকের বাস তাই ওখানকার অফিসটা ছোটই। শহরের একটু বাইরের দিকেই বাড়ি নিলাম যাতে ভূত বন্ধুর কোন অসুবিধা না হয় – ওখান থেকে সাইকেলেই অফিস যাতায়াত করতে পারবো। ছোট খাটো আলাদা বাড়ি বেশ বড় একটা আম বাগানের গা ঘেঁসে আর পেছন দিকে ধান ক্ষেত। বাড়িটা পাবার আগে কয়েক দিন ওকে ঝোলার মধ্যে নিয়েই অফিসে যেতাম তবে সারা দিন বেশ ভয়ে ভয়ে থাকতে হতো যদি কোন কারণে কেউ টের পেয়ে যায় তা হলে কি হবে? তা ছাড়া ঘাড়ে ঝোলা নিয়ে অফিসারকেও ঠিক মানায় না – প্রথম দিনই অফিসের দু-একজন ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিলো যেন কোথা থেকে এই ঝোলা ঘাড়ে গেঁয়ো ভূত এসে জুটলো। বাড়ি দেখে ভূত বন্ধু খুব খুশি –

'এই বাড়ি সব দিক দিয়ে খুব ভালো – আমি সারাদিন ওই আম বাগানে খোলা বাতাসে ঘুরে বেড়াতে পারবো। এত দিন ধরে ওই ঝোলার মধ্যে থেকে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম – তাছাড়া তোমাকেও আর সারাদিন আমার জন্য অস্বস্তিতে কাটাতে হবে না।'

আমি অবশ্য ওকে একটু সাবধান করে দিলাম,

'দ্যাখো, স্বাধীনতার আনন্দে সব ভুলে আবার তোমাদের নষ্টামী মানে লোক জনদের ভয় দেখানো শুরু করো না – তাহলে লোকে বুঝতে পেরে আবার কোন ওঝা নিয়ে আসবে।'

'আরে না না – ওঝার যা তাড়া খেয়েছি আর ওসব ব্যাপারে নেই - আমি খুব ভালো ভূতের মতই থাকবো। আশে পাশের কেউ টেরটিও পাবে না যে আমি এখানে আছি।'

পরদিন ওকে বাড়িতে রেখেই অফিস গেলাম তবে সারা দিন মনের মধ্যে একটু খচ খচ করতে লাগলো যদি ওর কোন অসুবিধা হয় অথবা এত দিন পর হঠাৎ ছাড়া পেয়ে কোন নষ্টামী না করে বসে সেই চিন্তায় তবে সব থেকে বড় বাঁচোয়া ওকে কেউ দেখতে পাবে না। সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে এসেই হাঁক পাড়লাম,

'কোথায় বন্ধু? আজ দিনটা কেমন কাটলো?'

'বুঝলে আজ পুরো এলাকাটা খুব সাবধানে ঘুরে দেখলাম – মনে হয় ভয় পাওয়ার মত কিছু নেই। আম বাগানে খুব ভালো জাতের আমের সব গাছ আর খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সারা দুপুর ওখানেই সব থেকে বড় গাছের মগডালে বসে আরাম করেছি। এত দিন পর বাইরের খোলা হাওয়াতে ঘুরে খুব

ভালো লাগছে।'

ভূত বন্ধুর সাথে কথা বলতে বলতে চা বানাচ্ছিলাম আর ও চায়ের কৌটো, চিনির কৌটো এই সব এগিয়ে দিচ্ছিলো – বাইরের কেউ দেখলে নির্ঘাৎ ভির্মি খাবে কারণ ভূত বন্ধুকে দেখা যায় না বলে মনে হবে কৌটো গুলো হাওয়াতে ভেসে ভেসে আসছে।

'জানো, দুপুরে একবার আমাদের ডান পাশের বাড়িতে ঢুকেছিলাম হাল চাল দেখতে।'

শুনেই আমি চমকে উঠলাম – কাপের চা ছলকে উঠলো।

'ঠিক কোন বদমাইসি করেছো?'

'আরে তুমি ঘাবড়াচ্ছো কেন – আমি তো কথা দিয়েছি কোন দুষ্টামী করবো না। আসলে খুব সুন্দর রান্নার গন্ধ বেরুচ্ছিলো তাই ওদের রান্নাঘরের জানালাতে বসে দেখছিলাম বাড়ির মহিলা কি রান্না করছেন। রান্নার ধরন আর গন্ধতেই মনে হলো মহিলার হাতের রান্না খুব ভালো। মাছের মুড়ি ঘন্ট বানিয়েছিলো ভালো গোবিন্দভোগ চাল দিয়ে – কি সুন্দর তার গন্ধ তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না – আমি পুরোটা শিখে নিয়েছি – এই রবিবারে বড় দেখে মাছের মুড়ো নিয়ে এসো তারপর আমি বলবো আর তুমি বানাবে। ভেবেছিলাম একটু খানি তোমার জন্য নিয়ে আসি তবে তুমি যদি রেগে যাও তাই আনি নি।'

'খুব ভালো করেছো আনো নি – মহিলারা চট করে বুঝতে পারে বাটিতে কেউ হাত দিয়েছে কিনা। পরে বেড়ালে মুখ দিয়েছে বলে হয়তো এত কষ্টের রান্না ফেলেই দিতো। ঠিক আছে একদিন বানানো যাবে না হয় তবে তুমি তো খেতে পারো না – আমার একা একা খেতে মোটেই ভালো লাগবে না।'

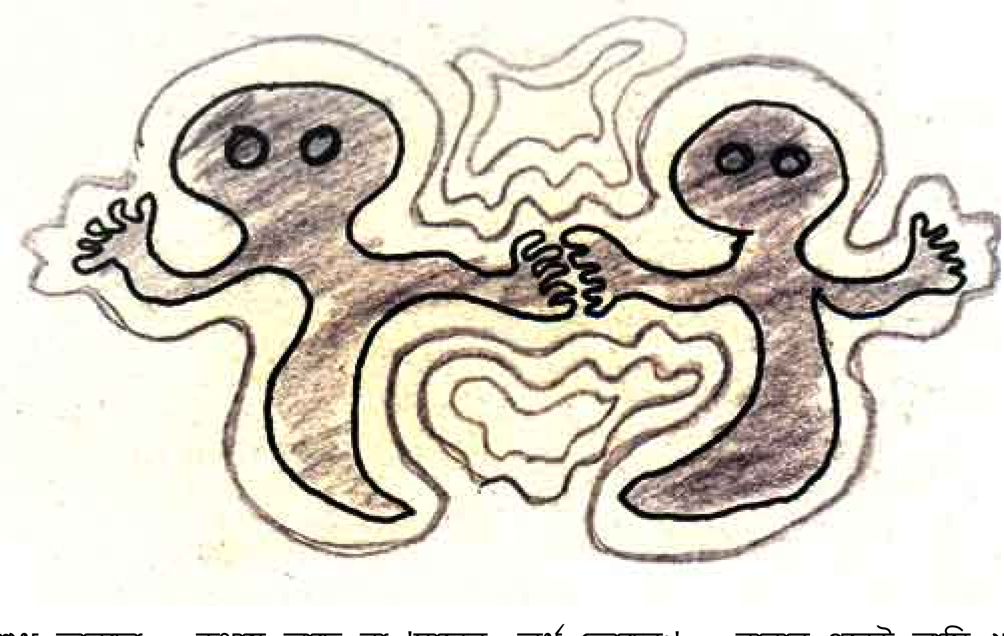

'তুমি শুধু শুধু ভাবছো – কথায় আছে না 'ঘ্রানেনঃ অর্ধ ভোজনং' – রান্নার গন্ধেই আমি খুশি। আজ তো ওই মহিলার রান্না মুড়ি ঘন্টের গন্ধেই যেন আমার পেটটা ভরে আছে। এখন রোজ ওই মহিলার রান্না নজর দিয়ে দেখবো তাহলে তোমাকে অনেক রকমের রান্না শেখাতে পারবো আর আমারও বেশ

গন্ধ শোঁকা হবে।'

পরদিন বিকেলে বাড়ি ফিরতে ভূত বন্ধু পাড়ার আর এক বাড়ির গল্প শুরু করলো। আমি হেসে ফেললাম,

'তুমি তো দেখছি বুড়ি পিসীমার মত পাড়া-বেড়ানি হয়ে গেলে – সবার হাঁড়ির খবর নিতে শুরু করেছো।'

ভূত বন্ধু মনে হলো একটু লজ্জাই পেয়েছে,

"যাঃ, তুমি যা ভাবছো তা মোটেই নয়। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে যা নজরে পড়ে তাই তোমাকে বলি। ওই মহিলা না ভীষণ ছুঁচিবাই গ্রস্ত তার উপর আবার হাড় কেপ্পন – সারা দিনে তিন চারবার সমস্ত বাড়িটা ধোয়া পোঁছা করেন ফলে রান্না করার দায়িত্ব বেচারি কর্তার ওপর - শুধু পাতলা করে মুগের ডাল আর ভাত তার সাথে কাঁচা লঙ্কা – ছেলে মেয়ে দুজনের তো হেনস্তার শেষ নেই। এদিকে সারাদিন জল ঘেঁটে ঘেঁটে ভদ্রমহিলার হাতে পায়ে হাজা হয়ে গিয়েছে – সত্যিই সংসারে কত রকমের লোকই না হয়।'

বেশ চলছিলো আমাদের সংসার – ভূত বন্ধুর দৌলতে অনেক রকম ভালো ভালো রান্না শিখে গিয়েছি আর ওর সব থেকে বড় গুণ ছিলো গন্ধ শুঁকে বলে দিতো রান্নাতে কি গোলমাল হয়েছে। আমের দিনে প্রায় রোজই একটা দুটো ভালো ল্যাংড়া আম চলে আসতো বাগান থেকে। আমি বারণ করলে ভূত বন্ধু হাসতো,

'আরে মিছি মিছি ঘাবড়াচ্ছো কেন। বাগানে হাজার হাজার আম থেকে একটা দুটো গেলে কে ধরতে পারবে? বাদুড়ে তো অনেক বেশী আম নষ্ট করে।'

কয়েকদিন ধরেই মনে হচ্ছিলো ভূত বন্ধু একটু আনমনা, সেদিন দেখি কথা বলতে বলতে হঠাৎই চুপ হয়ে কি যেন ভাবছে - সাধারণতঃ ও খুবই বাক্যবাগীশ তাই জিজ্ঞেস করলাম,

'কী হলো? আজ মনে হচ্ছে তোমার গল্প করতে ভালো লাগছে না – কী ব্যাপার?'

'না মানে – এই আর কি।'

একটু অভিমান দেখিয়েই বললাম,

'ঠিক আছে, আমাকে বলতে না চাইলে বলো না।'

'না না – তা নয়। কদিন ধরেই ভাবছি তোমাকে বলবো তবে ঠিক ভরসা পাচ্ছি না।'

'তা বলতে এত দোনামনা কেন?'

'না - - মানে - - একটু লজ্জাই করছে।'

'সে কি? আমাকে বলতে লজ্জা করছে?'

তারপর ওর মুখের টুকরো ঘটনা থেকে জানতে পারলাম, সপ্তাহ খানেক আগে ওই আম বাগানে হঠাৎই

এক পেত্নী মানে মেয়ে ভূতের সাথে ওর দেখা হয় – সে বেচারি অনেক জায়গা থেকে তাড়া খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে এই আম বাগানে এসে হাজির হয়েছে। প্রথম দেখাতেই দুজনের দুজনকে পছন্দ হয়ে গিয়েছে। এখন আমার বন্ধুটি একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছেন – ইচ্ছে দুজনে বিয়ে করে বরাবরের মত ওই আম বাগানে বাসা বাঁধে।

'আরেঃ, এই কথা বলতে তোমার এত লজ্জা। এত খুবই ভালো কথা – তোমার যদি উপযুক্ত সঙ্গিনী জোটে তবে আমিই সব থেকে বেশী আনন্দিত হবো। তা একদিন নিয়ে এসো না আলাপ করাতে – অবশ্য দেখতে তো পাবো না তবে কথা বলতে আপত্তি কিসের।'

'না - - মানে - - ও তো খুবই লাজুক। আজ অবশ্য এক রকম জোর করেই নিয়ে এসেছি – ঐ তো ঘরের কোনার মোড়াতে বসে আছে।'

আমি তো পেত্নীকে দেখতে পাচ্ছি না তাই মোড়ার দিকে হাত তুলে নমস্কার করে বললাম,
'আমার এই বন্ধুর মত ভূত আপনি আর পাবেন না। প্রার্থনা করি আপনারা সুখে শান্তিতে সংসার করুন। আমি যতদিন এখানে আছি এই বাড়ির দরজা আপনাদের জন্য খোলা রইলো। মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই দেখা হবে।'

খুব আস্তে একটু চাপা গলা ভেসে এলো,

'আপনার কথা ওর কাছে অনেক শুনেছি। আপনাদের বন্ধুত্বের তুলনা হয় না – আমরা মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই আসবো এখানে গল্প টল্প করতে।'

'ঠিক আছে বন্ধু – এবার তাহলে বিদায়।'

অঞ্জন নাথ
ব্যাঙ্গালোর, কর্ণাটক

কুটুস ও ভিখারী

কুটুস ছোট্ট একটা ছেলে.কতই বা বয়স হবে--পাঁচ কিম্বা ছয়!
ক্লাস ওয়ান স্ট্যান্ডারডে উঠলো এবার.খুব চঞ্চল,কারো কথা শুনতে চায় না। সব সময়, ঘরময় দাপিয়ে চলেছে.মা কুটুর,কুটুস ডাকতেই থাকেন--কে কার কথা শোনে!পাড়া পড়শী আশ পাশের সব ঘরেই তার অবাধ গতি,এমন ছটফট সুন্দর বাচ্চা সবারই ভালো লাগে.

মা বাবার একমাত্র ছেলে,আবদারে আবদারে সব সময় তটস্থ করে রাখে মা বাবাকে। যতটা পারেন তাঁরা ওর আব্দার রক্ষা করে চলেন. সবার সঙ্গে অতি অল্প সময়ের মধ্যে মিলে মিশে যায় কুটুস। পাড়ার কে না তাকে ভালবাসে-- লোকুদা থেকে শুরু করে নীলেশ,পাখী,চয়ন,তরুণ এমনি অনেক অনেক দাদা দিদিরা আর তেমনি আঙ্কেল আন্টির দলের শেষ নেই।

সকাল বেলা থেকেই বায়না ধরেছে ক্রিকেটের ব্যাট বল চাই, এবং তা আজই, এখনি। অনেক বোঝানোর পর ঠিক হলো এখনি তো আনতে যাওয়া সম্ভব নয়,আজ বিকেলে অবশ্যই ব্যাট বল এসে যাবে কুটুসের জন্য। সময়মত ব্যাট বল এলো এবং খেলা শুরু হয়ে গেলো। বাবা আর ছেলেতে। মাকেও খেলায় যোগ দানের জন্য অনেক বলেছিল কুটুস।ঘরের অনেক কাজের অজুহাতে মা খেলার হাত থেকে পার পেয়ে যান। অগত্যা বাবার সঙ্গে কিছু সময় খেলে পারার দাদা দিদিদের জুটিয়ে মাঠে নামে

কুটুস।

এমনি ভাবে দু তিন দিন চলতে থাকে খেলার দৌড়.কত দিন আর এক খেলা ভালো লাগে! ক্রিকেটের পরে ওর পিংপং বল ব্যাট চাই,কখনো ছবি আঁকার ঝোঁক এলো তো চাই রং পেন্সিল,তুলি রং সব কিছু।

এমনি দিনে পরিচিত বিশু ভিখারী দরজায় এসে দাঁড়ালো। বিশু ভিখারীকে এখানকার সবাই চেনে। তিন চার মাস ধরে ও এ পাড়ায় ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে। হাসি খুশি মুখ.একটা পা একটু টেনে চলে.বাচ্চাদের সাথে খুব ভাব তার.ছোট বড় নানা রকম গল্প ফেঁদে বাচ্চাদের খুব জমিয়ে রাখে.কোনো ঘর থেকেই সে খালি হাতে ফেরে না। পয়সা,খাবার,কাপড় চোপর, সবই সে বাড়ি বাড়ি থেকে পেয়ে যায়। প্রয়োজনে বাঁকা পা টেনেই দু চার মিনিট কুটুসের সঙ্গে খেলতে নেমে পড়ে।

বিশু ভিখারীর হাতে সর্বদা একটা লাঠি থাকে। পা সোজা করে চলতে পারে না,লাঠির সাহায্য নিতে হয়। ও থাকে দু কিলোমিটার দূরে--বিলহারী গ্রামে। এ দু কিলোমিটার ও ভিক্ষা করতে করতে এসে যায়। ভিক্ষা করে যা পায় ওর মত একজন লোকের ভালো ভাবে চলে যায়.বিশুর বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে হবে.তবু বাচ্চা সুলভ ব্যবহারের জন্য বাচ্চাদের সঙ্গে খুব ভাব।

সে দিন সকাল বেলা,ঘড়ির কাঁটায় বেলা বারটা। কুটুসের মা কুটুসের স্নান করান এ সময়, কুটুস ওরা মাঠে খেলছিল,সঙ্গে দাদা,দিদিদের দল--ওই নীলেশ,চয়ন,পাখীদের সঙ্গেই খেলছিল,বিশু ভিখারীও বাচ্চাদের খেলায় কিছু ক্ষনের জন্য যোগ দিয়ে ছিলো। মাঠে এসে কুটুসের মা কুটুসকে দেখতে পেলেন না.নীলেশ,চয়ন,পাখী ওরা কুটুসের ব্যাট বল নিয়ে খেলে চলেছে,কিন্তু যার ব্যাট বল সেই অনুপস্থিত।

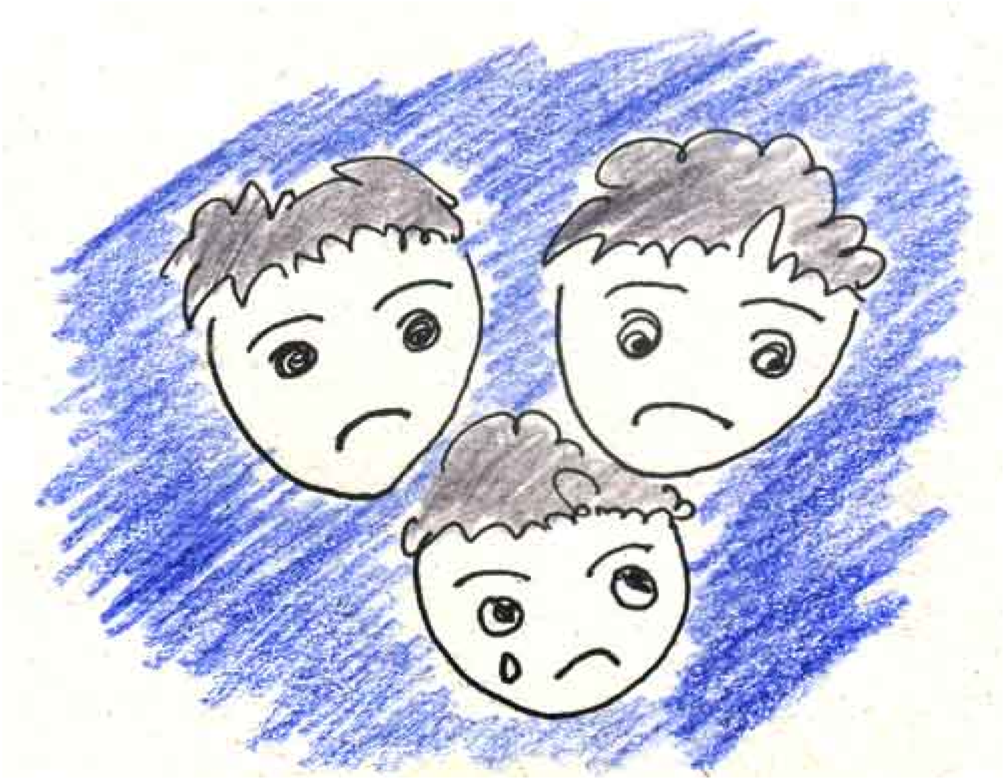

কুটুস কই রে নীলেশ?কুটুসের মার প্রশ্নে নীলেশ এদিক ওদিক চোখ বুলিয়ে বলে,আমাদের সঙ্গেই তো খেলছিল ও,গেছে হয়ত আশেপাশে,বলে আবার খেলতে লেগে গেল।

কুটুসের মা,কুটুস,কুটুস,ডাকতে ডাকতে আশপাশে বাড়িতে খুঁজতে বের হলেন। স্নানের সময় হয়ে গেল,কোথায় যে গেল ছেলেটা!দিন ভর খেলা,খেলা,আর খেলা-- একটুক্ষণ যদি ঘরে থাকে,মনে মনে কথাগুলি আওড়াতে থাকেন আর খুঁজে বেড়াতে থাকেন ছেলেকে।

এক ঘন্টার মত খোঁজার পর যখন ছেলের দেখা মিল না,মার মনে এবার চিন্তা হতে লাগলো.চয়ন,পাখী,নীলেশ সবাই আশেপাশে কুটুসকে খুঁজতে বের হলো। কেউ বলল,যাবে কোথায়,দেখো,কারো ঘরে চুপ করে বসে হয়ত খেলছে!এমনি হয়, দেখা যায় কারো ঘর থেকে খেলেটেলে বেরিয়ে আসছে কুটুস। কিন্তু দীর্ঘ এক ঘন্টার ওপরেও যখন কুটুসের খোঁজ পাওয়া গেল না,মা,বাবা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এ পাড়া, সে পাড়া,গলি ঘুপচি কোথাও তার খোঁজ পাওয়া গেলো না। কুটুস কোথাও নেই,কুটুসকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না.হন্যে হয়ে সবাই খুঁজে বেড়াচ্ছে, অনেক সময় হয়ে গেছে সে নেই। মা কাঁদতে লাগলেন,বাবা হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগলেন.আশপাশের সবাই ভালোবাসে কুটুসকে,ওরা সবাই কোথাও না কোথাও খোঁজায় ব্যস্ত হোয়ে গেলো।কুটুস নেই।এখানে নেই। ওখানে নেই। কুটুস কোথাও নেই। বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যে হতে চলল। কুটুসের বাবা রমেনের বন্ধু,এখানকার পুলিশ সুপার.তাঁকেও খবর দেওয়া হয়েছে--সে মত পুলিশ এসে জিজ্ঞাসাবাদ করে গেছে।ও দিকে বিলহারি গ্রামে বিশু ভিখারী যেখানে থাকত খোঁজ নেওয়া হয়েছে.সকাল থেকে ও নাকি ঘরে নেই.ভিখারী বাইরে বাইরে ঘুরতে পারে--এমন কি এক আধ দিন ঘরে নাও আসতে পারে,কাজেই সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ঘরে না আসার জন্য কুটুসের হারানোর ব্যাপারে ও জড়িত এটা বলা সম্ভব নয়.পুলিশ খুঁজছে -- আর যেহেতু পুলিশ সুপার রমেনের বন্ধু--খোঁজা খুঁজির দিক থেকে কোনো ঢিল হবে বলে মনে হয় না।

কুটুসের বাড়িতে কান্না কাটির রোল পড়ে গেলো.বাবা মা দুজনেই কাঁদছেন.পড়শীরা যাঁরা আসছেন-- চঞ্চল অস্থির সবার সঙ্গে এত সহজে মিলে মিশে যাওয়া একটা জলজ্যান্ত ছেলের এমনি হটাত হারিয়ে যাওয়ায় চোখে জল রাখতে পারছেন না.

ট্রেন মুম্বাইয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে,বিশু ভিখারী ধোপদুরস্ত হোয়ে বসে আছে ট্রেনের সিটে, পাশে বসে আছে কুটুস।

--আর কতদুর তোমার মুম্বাই?অধৈর্য্য হয়ে বলে ওঠে কুটুস,আমরা কখন ঘরে ফিরব?
এমনি একের পর এক প্রশ্ন করে চলেছে।

--আমাদের ট্রেন অনেক দেরী করে ফেলল,তাই আজ আর আমরা ঘরে ফিরতে পারব না, কাল মুম্বাই ঘুরে দেখবো,আর সন্ধ্যের মধ্যেই ঘরে ফিরে আসবো,কেমন?বিশু ভিখারী অনেক বুঝিয়ে যাচ্ছে কুটুসকে.শত শত প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে।

বিশুর এখন ভিখারীর বেশ নেই.অন্য সাধারণ লোকের মতই তার বেশভূষা.পা টান টান করে চলার বদলে দিব্বি পা স্বাভাবিক রেখেই চলা ফেরা করছে.আর কুটুসের চেহারা বেশ- বাশ এমন রাখা হয়েছে যে কেউ বলতে পারবে না এক ভিখারী ছেলে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে!

প্রায় রাত দশটার সময় ওরা পৌঁছালো মুম্বাই.তারপর ট্যাক্সিতে এক ঘন্টা ধরে অনেক রাস্তা পার হয়ে সোজা পৌঁছে গেলো বিশু নিজেদের আড্ডায়। কুটুস তখন ঘুমে আচ্ছন্ন,বিশু ওরফে বিশ্বনাথ রাস্তায় ওকে এটা ওটা কিনে খায়িয়েছে.ভোলাবার জন্য তাকে কম অভিনয় করতে হয়নি!তিন মাসের ওপর থাকতে হয়েছে জবলপুরের বিলহারীর মত গ্রামে!কত ছেলে, কত লোকদের সঙ্গে ভাব করতে হয়েছে.অনেক পটিয়ে পাটিয়ে কুটুসকে নিয়ে আসতে পেরেছে। আড্ডা পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছে যখন,তখন পুরোপুরি কাজ তার শেষ।

বিরাট বড় ফুটবল মাঠের মত,চারিদিকে পাকা দেওয়াল দিয়ে জাগাটা ঘেরা। তার মধ্যে এক কোনায় তিন চারটে ঘর,ঘরগুলি দেখলে অনেক পুরনো মনে হয়.বাইরে থেকে একটা ঘরে খুব কম পাওয়ারের আলো দেখা যাচ্ছিল। বিশ্বনাথ কুটুসকে কোলে নিয়ে আলো জ্বালা ঘরের দরজার সামনে পৌঁছে গেলো.দরজা ধাক্কা দিয়ে চাপা স্বরে ডাকতে লাগলো,জগুভাই! জগুভাই!

দু তিনবার ডাক দেবার পর ঘরের ভিতর থেকে 'কৌন?' বলে খুব গম্ভীর আওয়াজ এলো!

--আমি বিশ্বনাথ,দরবাজা খোলো,সাহাব!বিশ্বনাথ বলে.

এ এলাকা রাত দশটা বাজতে না বাজতেই ঝিমোতে থাকে,চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসে,-- দুরে দু চারটে ঘরে--টিম টিম করে আলো জ্বলছে,দেখলেই মনে হয় জায়গাটা মুম্বাই মহানগর থেকে অনেক বাইরে। ঘড়.র.র..করে দরজা ধীরে ধীরে খুলে গেলো.সামনে দাঁড়িয়ে ভীম নাথ, দলের সাগরেদ.জগু দলের স্থানীয় ম্যানেজার,এখানকার সমস্ত কাজের দযিত্ব ওর ওপর। তারই হেলপার ভীম।

--অন্দর আ যা,ভীম চাপা স্বরে বলে ওঠে।

কাঁধে ঘুমন্ত কুটুসকে নিয়ে ঘরের ভিতর প্রবেশ করে বিশ্বনাথ।জগু এগিয়ে আসে,বলে, কিরে জিন্দা হায় না?ছোট্ট কুটুস ওদের কথাবার্তায় ঘুমের মধ্যে একবার চোখ মেলে দেখার চেষ্টা করে,আবছা অন্ধকারে কাউকে চিনতে না পেরে আবার ঘুমিয়ে পড়ে.

--লেড়কা জিন্দা হায়,দেখ লিয়া না?বলে বিশ্বনাথ। অব মেয় জাউংগা,মেরা পয়সা দে দো সাহাব!।

জগু টাকা এনে বিশ্বনাথের হাতে দিল। বিশ্বনাথ ছেলে পাচারের পাঁচ হাজার টাকা হাতে নিয়ে কুটুসকে ঘরের খাটিয়াতে শুইয়ে দিয়ে বাইরের অন্ধকারে অদৃশ্য হোয়ে গেলো।

সকাল থেকে কুটুসের হাত মুখ বাঁধা,মুখে কাপড় ঠুসে দেওয়া,যাতে ও চীত্কার করতে না পারে।বড় বড় ষন্ডা গুন্ডা মার্কা লোক এঘর ও ঘর ঘুরে বেড়াচ্ছে। দীনু,অংকু,ভীম, আনোয়ার এমনি সব নাম ওদের।এর মধ্যে আনোয়ারের কাজ সব পঙ্গু ছেলে মেয়েদের সকাল বেলা নিয়ে গিয়ে ভীড় হওয়া রাস্তার মোড়ে মোড়ে ভিক্ষা করার জন্য বসিয়ে আসা। দিন ভর ওরা ভিক্ষা করে,আবার সন্ধ্যের পর আনোয়ার ওদের ঘরে নিয়ে ফেরে। ওদের পাওয়া টাকা পয়সার নব্বই পার্সেন্ট যাবে মালিকের হাতে। বাকী দশ পার্সেন্টে এখানকার কাজ কর্ম চলে.সবার মাইনে,অন্যান্য সমস্ত খরচ। এখানকার মালিককে একমাত্র জগু বলে লোকটাই চেনে। আর কেউ নয়। বাচ্চাদের হাত পা,জীভ কেটে পঙ্গু তৈরী করার কাজ ভীম,দীনু,অংকু ওদের ওপর দেওয়া আছে।

কুটুস গোঁ গোঁ করে চীত্‌কার করার চেষ্টা করছিল,ভীম এসে তার মাথায় জোরে থাপ্পড় মারলো.বাঁধন খোলার কত না চেষ্টা করছে কুটুস। কিন্তু পারবে কেন?জীবনে এত শক্ত বাঁধন পৃথিবীর কোথাও থাকতে পারে সেটা কি ও কোনো দিন চিন্তা করতে পেরে ছিলো!দু চোখ বেয়ে তার জলের ধারা বয়ে যেতে লাগলো। কতবার সে চীত্‌কার করে মা বাবার কাছে যেতে চাইল।কোনো শব্দই মুখ থেকে বেরোতে পারলো না। অংকু ভীমকে প্রশ্ন করে,কেয়া নাম উসকা--ইউ.পি.সে জো ছোকরা কো লায়া গয়া?

ভীম উত্তর দেয়,পরেশ নাম হায় উসকা।উসকা আজ তারিখ হায় না?তিন দিন পর আজ এক অংক জাদা হো যায়েগা--ছাব্বিশ হো যায়েঙ্গে।

পরেশকে অংকু,দীনু ওরা নিয়ে গেল,এক কোনার ঘরে। একটু পরেই ওই ঘর থেকে অস্ফুট কান্নার চাপা চীত্‌কার শোনা গেল। পরেশের জীভ কেটে দিল ওরা,অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ও অজ্ঞান হোয়ে গেলো,আবার ওর মুখে গুঁজে দিল কাপড়ের গোলা। জ্ঞান ফিরে ও যাতে চীত্‌কার করতে না পারে। পরেশ আর কোনো দিন কথা বলতে পারবে না।

এক মাস কেটে গেলো.ইতিমধ্যে তিনজন বাচ্চাকে শরীরের কোনো অংগ কেটে পঙ্গু বানানো হয়েছে। কুটুসের সময় আসবে--এমনি জল্লাদের দল ওকে নিয়ে যাবে--হাত পা কেটে ফেলবে--আর একদিন কুটুস বাটি হাতে করুণ ভাবে কেঁদে কেঁদে ভিক্ষা চাইবে--খানা দে,রোটি দে বাবু!গরীব কো এক পয়সা দে বাবু!...কুটুসের পঙ্গু চেহারা দেখে--হাত পা কাটা এইটুকু একটা ছেলেকে দেখে অনেকের দয়া হবে,পয়সা, কাপড় চোপর,খানা দেবে।

বসের ফোন এলো জগুর কাছে। একমাত্র জগুই এখানে মোবাইল রাখার যোগ্য।
বস বললো,ও ছোটা লেড়কা বশ মে আয়া?--রোনা ধোনা কম কিয়া?

--নেহী, সাহাব..এক দো দিন মে সব ঠিক হো যায়েগা,জগু বলে।

--বাহার সে এক সাহাব আয়েগা,মেরী চিটঠি লে কর,উস্ কে হাত মে লেড়কা কো দে দেনা,ও বিক গয়া। ও আদমী আগলে মাহ উসকো ফরেন লে যায়েগা।শুন লিয়া না! বলে বস ফোন রেখে দেয়.

--জী হাঁ--জগুর মুখ থেকে ভয় মাখা উত্তর বের হয়ে আসে।

মাস ঘুরে গেলো,কুটুসের মা বাবা দুঃখে ভেঙে পড়েছেন.মা তো প্রায় সব সময় ছেলের কথা মনে করে কাঁদতে থাকেন।বাবা রমেন ছেলে হারানোর শোকে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। রোজ অফিস যাচ্ছেন,ঘরে ফিরছেন আর চুপচাপ ঘরে বসে থাকছেন। এমনি একদিন অফিস থেকে ডিউটি পড়ল বিলাসপুর।দুদিন থাকতে হবে সেখানে।প্রথমে ভাবলেন যাবেন না তিনি,তারপর কি ভেবে যেন তাঁর মনে হলো,যাই একবার ঘুরে আসি-- সারা জবলপুরের অলিগলি সব জাগা তো দেখা হয়ে গেল--কে জানে অন্য কোনো জায়গায় অন্য কোনো পথে হঠাত যদি দেখা হোয়ে যায় কুটুসের সঙ্গে!

বিলাসপুর খুব ভোরে পৌঁছালো ট্রেন.ভোরের আলো সবে মাত্র ফুটছে,রমেন স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে একটু দুরে এক ভিখারীকে লাঠি নিয়ে এক পা খোঁড়াতে খোঁড়াতে হেঁটে যেতে দেখে থমকে দাঁড়ালেন.ভালো করে লক্ষ্য করে দেখতে লাগলেন, আরে, বিশু ভিখারী না!দৌড়ে তার সামনে

গিয়ে দাঁড়ালেন.বিশু ভিখারী পালাবার চেষ্টা করেও পালাতে পারল না.রমেন সমস্ত গায়ের জোর দিয়ে বিশুকে ধরে নিলেন,আর চোর,চোর,বলে চীত্কার করতে লাগলেন.স্টেশনে অনেক লোক জড়ো হোয়ে গেলো,রেলের পুলিশ এসে বিশু ভিখারী ওরফে বিশ্বনাথকে ধরলো,রমেন তার বন্ধু পুলিশ সুপারকে ফোন করলেন.জবলপুর থেকে এলো পুলিশদল,ওরা বিশুকে জবলপুর নিয়ে আসলেন.এরপর চলল নানারকম জেরা।

বিশু নিজের অপরাধ স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে ওদের দলের সব কথা ফাঁস করে দিল। পুলিশদল বিশুকে নিয়ে পৌঁছালো মুম্বাই--সেই ছেলে ধরার আড্ডায়। আড্ডার দরজায় রাত্রি এগারটায় পুলিশ ধাক্কা দিল.

--কৌন?ভিতর থেকে জগুর কথা শোনা গেলো।

--হামি জগু সাহাব,এক বাচ্চা লায়া,পুলিশের শেখানো কথা বলে ওঠলো বিশু,আর দরজা খোলা মাত্র পুলিশের দল ধরলো জগুকে। পালাতে গিয়ে ধরা পড়ল আনোয়ার,ভীম, দীনু। অঙ্কু দেওয়াল টপকে পালাতে গেলো,কিন্তু তার আগেই পুলিশের গুলি বিদ্ধ হলো তার পিঠে।

তিরিশ জন ছেলেকে পেয়ে গেলো পুলিশ,অন্ধ,হাত পা কাটা--পঙ্গু ছেলেদের সংখ্যা ছিলো সাতাশ.বাকী তিন জনের সঙ্গে কুটুস ছিলো অক্ষত অবস্থায়.আর দুটো দিন গেলে বিক্রি হয়ে যাওয়া কুটুসকে বিদেশী লোকটা নিয়ে যেত--কুটুস পৃথিবীর কোনো কোনে হারিয়ে যেত! কেউ তাকে খুঁজে পেত না। তিনজন অক্ষত ছেলেরা ছিলো হাত পা বাঁধা,মুখে তাদের কাপড় গোঁজা ছিলো.কোনোমত আধ পেটা খেয়ে পড়েছিল তারা--এক সপ্তাহ থেকে এক মাসের ওপর পর্যন্ত! সবাইকে উদ্ধার করল পুলিশ।

কুটুস ঘরে ফিরল।

--কুটুস,কুটুস,বাবা তুই কোথায় ছিলি!কোথায় গিয়ে ছিলি বাবা!বলে,কুটুসকে জড়িয়ে ধরে অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়ল তার মা। দুষ্টু কুটুস,অশান্ত কুটুস,মার কোল জড়িয়ে থাকলো.সে স্তব্ধ রইল,কোনো জবাব মুখ থেকে বের হলো না তার,এই পঁয়ত্রিশ দিনের বন্দী জীবনে যেন তার পঁয়ত্রিশ বছর বয়স বেড়ে গেছে।

তাপসকিরণ রায়
জবলপুর, মধ্য প্রদেশ

বিদেশী রূপকথা: ছোট্ট ইডার ফুল গুলি

"আমার সব ফুলগুলো প্রায় মরেই গেল", বলল ছোট্ট ইডা, " গতকাল সন্ধ্যাবেলায় এগুলি কত সুন্দর ছিল, আর এখন, সব পাতাগুলি কেমন ঝুলে পড়েছে। এরকম কেন হয় ..." সে সোফায় বসে থাকা তার বাবার ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করল। এই ছাত্রকে তার খুব পছন্দ, সে নানারকমের মজার মজার গল্প বলে, সুন্দর সুন্দর ছবি কেটে দেয়ঃ মেয়েরা নাচছে, দরজা খুলে যাওয়া রাজপ্রাসাদ, ফুল, পাতা; ওকে তার খুব পছন্দ। " আমার ফুলগুলি আজকে এত ফ্যাকাশে লাগছে কেন?" সে আবার জিজ্ঞাসা করল, নিজের হাতের শুকিয়ে যাওয়া ফুলের তোড়াটার দিকে তাকিয়ে।

"তুমি জাননা ওদের কি হয়েছে?" ছাত্রটি বলল, " ফুলগুলি গত রাতে একটা বল নাচের আসরে গেছিল, আর সেই কারণে, খুব স্বাভাবিকভাবেই, ওরা ক্লান্ত।"

"কিন্তু ফুলেরা কি নাচতে পারে?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল ছোট্ট ইডা।

"হ্যাঁ, অবশ্যই, ওরা নাচতে পারে, " বলল ছাত্রটা। " যখন অন্ধকার হয়ে যায়, আর সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, ওরা তখন আনন্দে নেচে বেড়ায়, প্রায় প্রতি রাত্রেই।"

" ছোটরা কি এই নাচের আসরে যেতে পারে?"

"হ্যাঁ, " বলল সেই ছাত্র। " ছোট্ট ছোট্ট ডেইসি আর লিলি অফ দ্য ভ্যালি।"

"এই সুন্দর ফুলগুলি কোথায় নাচতে যায়?" জিজ্ঞেস করল ছোট্ট ইডা।

"তুমি কি শহরের দরজার বাইরে বিরাট প্রাসাদটাকে দেখনি, যেখানে রাজা গ্রীষ্মকালে থাকতে আসেন, আর যেখানে একটা ফুলে ভর্তি দারুণ সুন্দর বাগান আছে? আর যখন রাজহাঁসগুলি তোমার দিকে ভীড় করে এসেছে, তুমি তাদেরকে রুটি খেতে দাওনি? ঐখানেই, ফুলেদের নাচের আসর বসে, বিশ্বাস কর!"

"আমি তো গতকালই মায়ের সাথে ওই বাগানে গেছিলাম, " বলল ইডা, " কিন্তু সব গাছ থেকে পাতা পড়ে গেছিল, আর একটা ফুল ও ছিল না। ওরা সব কোথায় গেল? আমি গরমকালে কত ফুল দেখেছিলাম।"

"ওরা সবাই রাজপ্রাসাদে ছিল, " বলল সেই ছাত্র, " শোন, যেই রাজা আর তাঁর মন্ত্রী-সান্ত্রীরা রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে যান, সব ফুলগুলি তখন বাগান ছেড়ে প্রাসাদে চলে যায়, আর খুব আনন্দে থাকে। সবথেকে সুন্দর দুটো গোলাপফুল সিংহাসনে বসে, তাদেরকে বলা হয় রাজা আর রানী, আর লাল মোরগঝুঁটি ফুলেরা দুই পাশে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করে, তারা যেন রাজসভার অমাত্য। তারপরে সুন্দর ফুলেরা সবাই সভায় আসে, আর এক বিশাল নাচের আসর বসে। নীলরঙা ভায়োলেটরা হয় নৌসেনা, আর তারা হায়াসিন্থ আর ক্রোকাস্‌দের মত সুন্দরী মেয়ে ফুলেদের সাথে নাচ করে। টিউলিপ আর টাইগার লিলিরা হয় বয়স্ক অভিজাতদের মত, তারা খেয়াল রাখে রাজসভার নাচ নিয়ম কানুন মেনে হচ্ছে কিনা।"

" কিন্তু, " জিজ্ঞেস করল ছোট্ট ইডা, " রাজার প্রাসাদে নাচ করার জন্য কেউ ফুলগুলিকে বকে না?"

"কেউ তো জানতেই পারে না, " বলল সে ছাত্র। "প্রাসাদের বুড়ো প্রহরী, যে কিনা রাতের প্রহরায় থাকে, সে মাঝে মাঝে ভেতরে আসে; কিন্তু তার সঙ্গে থাকে একটা বিশাল বড় চাবির গোছা, আর ফুলেরা যখনই সেই চাবিগুলির ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ শুনতে পায়, তারা গিয়ে লম্বা পর্দাগুলির পেছনে লুকিয়ে পড়ে, আর চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, শুধু মাঝেমধ্যে একটু উঁকি মারে। আর বুড়ো প্রহরী বলে, " আমি ফুলের গন্ধ পাচ্ছি...", কিন্তু কিচ্ছুই দেখতে পায় না।"

"ওহ, কি দারুণ ব্যাপার," হাততালি দিয়ে বলল ছোট্ট ইডা, " আমি কি এই ফুল গুলিকে দেখতে পাব?"

"হ্যাঁ," বলল সেই ছাত্র, " এর পরের বার তুমি যখন যাবে, খেয়াল রেখ একটু, আর তুমি ওদেরকে দেখতেই পাবে, যদি তুমি জানালা দিয়ে উঁকি মার। আমি আজকে তাই করেছিলাম, আর আমি দেখলাম সোফার ওপরে একটা লম্বা হলুদ লিলি টান্‌টান্‌ হয়ে শুয়ে আছে। সে ছিল রানীর সখী।"

"আচ্ছা, বোটানিকাল বাগান থেকে কি সেখানকার ফুলগুলি এই বল নাচের আসরে যেতে পারে?" জিজ্ঞেস করল ইডা।" ওখান থেকে পথ তো অনেকটা!"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, " বলল সেই ছাত্র, " ওরা যখনই চায়, তখনই উড়তে পারে। তুমি কি সেই সুন্দর লাল, সাদা আর হলুদ রঙের প্রজাপতিগুলিকে দেখনি, যেগুলিকে ফুলের মত দেখতে? সেগুলি তো একসময়ে ফুলই ছিল। ওরা নিজেদের ডাঁটা ছেড়ে, আর নিজেদের পাতাগুলিকে ছোট ছোট ডানার মত নেড়ে উড়ে গেছে। তারপরে, যদি ওরা লক্ষ্মী হয়ে থাকে, ওদেরকে অনুমতি দেওয়া হয় দিনের বেলা উড়ে বেড়ানোর।ওদের আর চুপ করে ডাঁটার ওপরে বসে থাকতে হয় না, আর এইভাবে একসময়ে ওদের পাতাগুলি সত্যিকারের ডানা হয়ে যায়। তবে হ্যাঁ, এটা হতে পারে, যে বোটানিক্যাল বাগানের ফুলগুলি কোন দিন রাজার প্রাসাদে যায়নি, আর তাই, তারা ওখানে যে সব মজা হয়, সেসবের সম্পর্কে কিছুই জানে না। আমি তোমাকে বলছি তুমি ক করবে, আর ওই যে গাছপালার মাস্টারমশাই, যিনি তোমার পাশের বাড়িতে থাকেন, তিনি একদম অবাক হয়ে যাবেন। তুমি তো ওনাকে ভাল করেই চেন, তাই না? তাহলে শোন, এর পরে যেদিন তুমি ওনার বাগানে যাবে, তুমি যেকোন একটা ফুল কে বলে দেবে যে প্রাসাদে একটা বিরাট বল নাচের আসর বসবে, তাহলে সেই ফুলটা অন্যদেরকেও বলে দেব, আর ওরা সবাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রাসাদে উড়ে চলে যাবে। আর যখন ওই মাস্টারমশাই নিজের বাগানে হাঁটতে যাবেন, তখন একটাও ফুল থাকবে না। ভাব একবার, উনি কিরকম অবাক হয়ে যাবেন!"

"কিন্তু একটা ফুল অন্য ফুলগুলিকে বলবে কি করে? ফুলেরা কি কথা বলতে পারে?"

"না, তা পারে না, " উত্তর দিল ছাত্রটি, " কিন্তু ওরা সঙ্কেত পাঠাতে পারে। তুমি কি দেখনি যখন জোরে বাতাস বয়, তখন ওরা কেমন একে অপরের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ায়, আর নিজেদের সবুজ পাতাগুলি দিয়ে খস্‌খস্‌ শব্দ করে?"

"মাস্টারমশাই কি সঙ্কেতগুলি বুঝতে পারবেন?" জিজ্ঞেস করল ইডা।

"হ্যাঁ, সে উনি বুঝতে পারবেন। উনি একদিন সকালে নিজের বাগানে গেছিলেন, গিয়ে দেখেন একটা কাঁটাওয়ালা বিছুটি একটা সুন্দর লালা কার্নেশন কএ বিরক্ত করছে। সেটা বলছে, "তুমি কি সন্দর, আমার তোমাকে খুব পছন্দ"। কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের এই দুষ্টুমি পছন্দ হল না, কিন্তু বিছুটি কান মুলে দিতে গেলেন। তখন বিছুটি, নিজের কাঁটাগুলি দিয়ে, যেগুলি কিনা আসলে তার আঙুল, ওনাকে এত জোরে খোঁচা দিয়েছে, আর ওনার এমন চুলকানি হয়েছে, যে তারপর থেকে উনি আর বিছুটির ধারে কাছে ঘেঁষেন না।"

"ওহ, কি মজার ব্যাপার," হেসে উঠে বলল ইডা।

সোফায় বসেছিলেন একজন মুখ গোমড়া উকিলবাবু, যিনি বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি ছাত্রটিকে মজাদার ছবি কাটতে দেখলেই রেগে গজগজ করতেন। সে হয়ত কাগজ কেটে বানিয়েছে

ঝাঁটায় চড়ে উড়ে যাওয়া এক ডাইনিবুড়ি, অথবা, আকাশ থেকে ঝুলে থাকা একটা লোক, আর তিনি দেখলেই রেগে গিয়ে বলতেন, "কি করে একটা শিশুর মাথায় এইসব আজগুবি কথা কেউ ঢোকাতে পারে! কি অসম্ভব বাজে কথা সব!!" আজকেও তিনি গজগজ করে বললেন, "কি করে একটা ছোট্ট শিশুর মাথায় এইসব কথা কেউ ঢোকাতে পারে?"

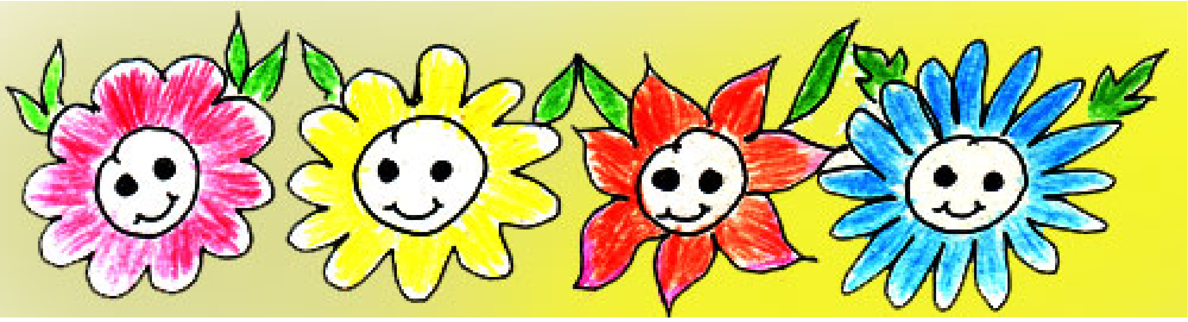

কিন্তু ছোট ইডার কাছে, ছাত্রটি এই যে ফুল নিয়ে গল্পগুলি বলেছিল, সেগুলি খুব মজাদার লাগল, আর সে সেগুলি নিয়ে অনেক অনেক ভাবল। ফুলগুলি সত্যিই মাথা ঝুঁকিয়ে ছিল, কারণ ওরা সারারাত নেচেছে, আর খুব ক্লান্ত ছিল, আর হয়ত ওদের একটু শরীর খারাপও ছিল। তারপরে সে ফুলগুলিকে নিয়ে সেই ঘরে গেল যেখানে একটা ছোট্ট সুন্দর টেবিলে অনেক খেলার জিনিষ রাখা ছিল, আর টেবিলের ড্রয়ারটা নানারকমের সুন্দর জিনিষে ভর্তি ছিল। তার পুতুল সোফি নিজের ছোট্ট বিছানায় ঘুমিয়ে ছিল। ইডা তাকে বলল, "সোফি, এবার তোমাকে ঘুম থেকে উঠতে হবে, আজ রাতের জন্য তুমি কষ্ট করে ড্রয়ারে থাক, ফুলগুলি খুব ক্লান্ত, আর তোমার বিছানায় আজকে ফুলগুলি শোবে, তাহলে হয়ত ওরা ভাল হয়ে যাবে।" এই বলে সে পুতুলটাকে তুলে নিল। সোফির মুখ দেখে মনে হচ্ছিল খুব রেগে গেছে, কিন্তু সে কিনা বিছানা ছাড়তে হচ্ছে বলে খুব রেগে গেছিল, তাই সে কোন কথা বলল না। ইডা ফুলগুলিকে পুতুলের বিছানায় শুইয়ে দিল, তাদের গায়ের ওপরে কাঁথা টেনে দিল। তারপরে সে তাদেরকে বলল লক্ষ্মী হয়ে শুয়ে থাকতে। তারপরে সে তাদের জন্য খেলার কেতলিতে চা বানিয়ে খেতে দিল, যাতে তারা একটু ভাল বোধ করে, আর পরের দিন ভাল হয়ে উঠতে পারে। তারপরে সে ছোট্ট বিছানাটার চারপাশ দিয়ে ভাল করে পর্দা টেনে দিল, যাতে তাদের চোখে রোদ না লাগে। সেই ছাত্র তাকে যা বলেছিল, সেইসব নিয়ে সারা সন্ধ্যা ধরে সে ভাবতেই থাকল। আর ঘুমোতে যাওয়ার আগে, সে আর থাকতে না পেরে, জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরে বাগানের দিকে উঁকি দিল, যেখানে তার মায়ের হাতে করা সুন্দর ফুলগুলি ফুটে ছিল - হায়াসিন্থ, টিউলিপ, আরো কত কি! তারপরে সে চুপিচুপি তাদেরকে বলল, "আমি জানি তোমরা আজ রাতে একটা বল নাচের আসরে যাবে।" কিন্তু ফুলগুলি এমন ভাবে স্থির রইল, যেন তারা কিছুই বোঝেনি, একটা পাতাও নড়ল না। কিন্তু ইডা একদম নিশ্চিত হয়ে গেল যে সে সব কিছু বুঝে গেছে। বিছানায় শুয়েও সে অনেকক্ষণ জেগে রইল, আর ভাবতে লাগল, রাজার প্রাসাদে সব ফুলগুলি যখন নাচবে, তখন দেখতে না জানি কতই ভাল লাগবে! "আমার ফুলগুলো কি সত্যি সত্যিই ওখানে গেছিল..." ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়ল। রাতের বেলা ইডার ঘুম ভেঙে গেল। সে স্বপ্নের মধ্যে তার ফুলগুলিকে, সেই ছাত্রকে আর সেই গোমড়ামুখো উকিলবাবুকে দেখছিল। তার শোবার ঘর নিঃস্তব্ধ, তার বাবা আর মা অঘোরে ঘুমাচ্ছেন, শুধুমাত্র রাতবাতিটা টিমটিম করে জ্বলছে। " আমার ফুলগুলো কি এখনো সোফির বিছানায় ঘুমিয়ে আছে," ভাবল ইডা, "জানতে পারলে বেশ হয়।" সে বিছানার থেকে মাথাটা একটু তুলল, আর পাশে

যে ঘরে তার খেলনা আর ফুলগুলি ছিল, সেই দরজার দিকে তাকাল। দরজাটা আধা খোলা ছিল, আর তার মনে হল, সেই ঘরে কে যেন খুব আস্তে, মিষ্টি সুরে পিয়ানো বাজাচ্ছে। এমন বাজনা সে আগে কোনদিন শোনেনি। "এখন সব ফুলগুলো নিশ্চয় ওখানে নাচ করছে, "ভাবল সে, " ওহ, আমার কি দেখতে ইচ্ছা করছে! " কিন্তু সে বিছানা থেকে নড়ল না, বাবা-মায়ের যদি ঘুম ভেঙে যায়! " আহা, ওরা যদি এই ঘরে আসত," সে ভাবল। কিন্তু কেউই এলনা, আর ওদিকে বাজনাটা এত সুন্দর ভাবে চলতেই থাকল যে সে আর ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারল না। সে নিজের ছোট্ট বিছানা ছেড়ে উঠে, পা টিপে টিপে দরজার কাছে গিয়ে উঁকি দিল। ওহ! কি দারুণ এক দৃশ্য সেখানে দেখা গেল! সেই ঘরে কোন রাত বাতি জ্বলছিল না, কিন্তু ঘরের মধ্যে যথেষ্ট আলো ছিল, কারণ জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে মেঝেতে পড়ে প্রায় দিনের মতই ঝকঝক করছিল। সমস্থ হায়াসিন্থ আর টিউলিপেরা লম্বা সারি দিয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল, জানালায় বা ফুলদানিগুলিতে একটা ফুলও ছিলনা। ফুলগুলি তাদের লম্বা লম্বা সবুজ পাতা দিয়ে একে অপরকে ধরে, মেঝেতে ঘুরে ঘুরে নাচ করছিল। পিয়ানোয় বসে বাজাচ্ছিল একটা বড় হলুদ রঙা লিলি। ইডার মনে হল এই ফুলটাকে সে গ্রীষ্মকালে দেখেছে, কারণ তার মনে পড়ল, সেই ছাত্রটা বলেছিল হলুদ লিলিটাকে দেখতে তার পিয়ানো দিদিমণি মিস লীনার মত। তখন সবাই তার কথা শুনে হেসেছিল, কিন্তু, এখন ইডার মনে হল, সেন সেই লম্বা, হলুদ ফুলটাকে দেখতে সত্যিই মিস লীনার মত! তাঁর মতনই ফুলটা মাথা এদিক ওদিক ঝুঁকিয়ে বাজাচ্ছিল, আর বাজনার তালে তালে মাথা দোলাচ্ছিল। তারপরে সে দেখতে পেল একটা উজ্বল বেগুনী রঙা ক্রোকাস এক লাফে গিয়ে উঠল তার খেলার টেবিলের ওপরে, আর গিয়ে পুতুলের বিছানার চারপাশ থেকে পর্দা সরিয়ে দিল; সেখানে শুয়ে ছিল সেই অসুস্থ ফুলগুলি, কিন্তু তারা এক লাফে উঠে বসল, আর অন্যদের দিকে মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে জানান দিল যে তারাও নাচ করতে চায়। পুরনো কাপড়ের পুতুলটা, যার কিনা মুখ ভাঙা, সে উঠে ফুলগুলিকে লম্বা কুর্নিশ জানাল। তাদের দেখে মনেই হচ্ছিল না যে তারা অসুস্থ, বরং তারা আনন্দে লাফিয়ে বেড়াচ্ছিল, কিন্তু তারা কেউই ছোট্ট ইডাকে খেয়ালই করল না।

তারপরে মনে হল টেবিলের ওপর থেকে কি যেন একটা লাফ দিয়ে পড়ল। ইডা দেখল, মেলায় কেনা রংচঙে লম্বা লাঠিটা ফুলেদের মাঝখানে লাফিয়ে পড়ে এমন হাবভাব দেখাচ্ছে যেন সে তাদেরই একজন। লাঠিটার মাথায় সেই উকিলবাবুর মত চওড়া টুপি পড়া একটা ছোট্ট মোমের পুতুল বসে ছিল। লাঠিটা ফুলেদের মাঝখানে পা ঠুকে ঠুকে নাচতে শুরু করল; ফুলেরা তার সাথে তাল মেলাতে পারল না, তাদের পা অত শক্ত নয় কিনা! হটাত করে লাঠীড় মাথায় বসে থাকা মোমের পুতুলটা যেন বড় আর লম্বা হতে থাকল, আর সে ঘুরে বসে ফুলগুলির দিকে তাকিয়ে বলল, " এইসব কথা তোমরা কি করে একটা শিশুর মাথায় ঢোকাতে পার? যত্ত সব আজগুবি ব্যাপার!" তখন পুতুলটাকে সেই উকিলবাবুর মতই রাগী রাগী দেখতে লাগছিল। কিন্তু কাগজের পুতুলগুলি তার রোগা রোগা পায়ে পিটুনি দিতেই, সে আবার ছোট হয়ে গিয়ে আগেকার মত পুঁচকে মোমের পুতুল হয়ে গেল। সেই দেখে ইডার এত মজা লাগল, যে সে না হেসে আর পারল না। লাঠিটা নেচেই চলল, আর তাই উকিলবাবুও নাচতে বাধ্য হলেন। তিনি নিজেকে বড় আর লম্বাই বানান, বা পুঁচকেই থাকুন, নাচতে তাঁকে হবেই। শেষ পর্যন্ত সব ফুলেরা গিয়ে অনেক কষ্টে রঙিন লাঠিকে নাচ থামাতে বাধ্য করল, বিশেষ করে সেই অসুস্থ ফুলগুলি।

এই সময়ে যে ড্রয়ারের ভেতরে ইডা সোফিকে ঢুকিয়ে রেখেছিল। তার ভেতর থেকে জোরে ঠকঠক আওয়াজ শোনা গেল। সেই শুনে কাপড়ের পুতুলটা এক দৌড়ে টেবিলের কোণায় গিয়ে, হুমড়ি খেয়ে পড়ে, ড্রয়ারটাকে টেনে খুলল।

তখন সোফি ভেতর থেকে উঁকি মেরে, চারিদিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলল, " আজ রাতে মনে হচ্ছে এখানে একটা বল্‌ নাচের আসর বসেছে...আমাকে কেউ বলেনি কেন?"

"তুমি আমার সাথে নাচ করবে?" জিজ্ঞাসা করল কাপড়ের পুতুলটা।

" হ্যাঃ, তোমার সাথে নাচ করি আর কি!" এই বলে সোফি মুখ ঘুরিয়ে পিছু ফিরে বসল।

সে ড্রয়ারের কোনায় পা ঝুলিয়ে বসে ভাবল, কোন একটা ফুল হয়ত তাকে নাচ করতে ডাকবে, কিন্তু কেউ এল না। তখন সে খুক খুক করে একটু কাশল, তা শুনেও কেউ এলনা। ওদিকে কাপড়ের পুতুলটা নিজে নিজেই নাচছে, আর খুব একটা খারাপ নাচ করছে না। যেহেতু কোন ফুলই তার দিকে নজর দিচ্ছে না, তাই সোফি ড্রয়ার থেকে মেঝেতে লাফ দিল, যাতে খুব জোর আওয়াজ হয়। সেই শুনে সব ফুলেরা তার দিকে দৌড়ে এল, আর জিজ্ঞাসা করল, তার কোথাও লেগেছে কিনা - বিশেষ করে সেই ফুলগুলি যারা তার বিছানায় শুয়ে ছিল। কিন্তু তার তো লাগেইনি। আর ইডার ফুলগুলি তার সঙ্গে খুব ভাল করে কথা বলল আর তাকে ধন্যবাস জানাল তার সুন্দর বিছানাটা তাদেরকে ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্য। তারা তাকে ঘরের মাঝখানে, যেখানে চাঁদের আলো এসে পড়েছিল, নিয়ে গেল, আর তার সঙ্গে নাচ করল। অন্য সব ফুলেরা তাদের ঘিরে ঘিরে নাচতে থাকল। তখন সোফি খুব খুশি হল, আর তাদেরকে বলল, তারা চাইলে তার বিছানায় আরো বেশি সময় থাকতে পারে, তার ড্রয়ারে থাকতে আপত্তি নেই। কিন্তু ফুলগুলি তাকে অনেক করে ধন্যবাদ জানাল, আর বলল -

"আমরা বেশিদিন তো বেঁচে থাকতে পারব না। আগামি কাল সকালে আমরা আরো শুকিয়ে যাব; আর তুমি ছোট্ট ইডাকে বলে দিও আমাদের যেন বাগানে ক্যানারি পাখির কবরের পাশে মাটি চাপা দিয়ে দেয়, তাহলে, পরের গ্রীষ্মে, আমরা আরো সুন্দর হয়ে ফুটে উঠব।"

"না, তোমরা মরে যেতে পারবে না, " বলে সোফি ফুলেদের চুমু খেল।

তারপরে ঘরের অন্য দরজাটা খুলে গেল, আর একগাদা ফুল নেচে নেচে ঘরে ঢুকল। ইডা ভেবেই পেল না তারা কোথা থেকে এসেছে, এক যদি না তারা রাজার বাগানের ফুল হয়। প্রথমে এল মাথায় ছোট্ট

সোনালি মুকুট পরা দুটি গোলাপ, তারা রাজা আর রানী। তাদের পিছু পিছু এল সুন্দরী স্টক আর কার্নেশনরা, তারা সবাইকে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানাল। তাদের সঙ্গে বাজনার ব্যবস্থাও ছিল। বড় বড় পপি আর পিওনিরা বাদামের খোলা দিয়ে বাজনা বানিয়েছিল, আর তাতে ফুঁ দিয়ে দিয়ে নিজেদের মুখ লাল করে ফেলেছিল। নীল হায়াসিন্থ আর সাদা স্নো-ড্রপেরা নিজেদের ঘন্টার মত দেখতে ফুলগুলিকে নাড়িয়েই যাচ্ছিল, যান সেগুলি সত্যিকারের ঘন্টা। তারপরে এল আরো অনেক ফুল ঃ ভায়োলেট, ডেইসি, লিলি অফ দ্য ভ্যালি, আরো অনেকে, আর তারা সবাই একসঙ্গে নাচ করতে থাকল। সে এক দেখার মত দৃশ্য হল বটে!

শেষ অবধি ফুলেরা একে অপরকে শুভরাত্রি জানাল। তারপরে ছোট্ট ইডা চুপি চুপি ফিরে এসে তার নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল, আর যা যা দেখেছে তার স্বপ্ন দেখতে শুরু করল। পরের দিন সকালে যখন তার ঘুম ভাঙ্গল, সে ছুট্টে গেল তার টেবিলটার কাছে, ফুলগুলি আছে কিনা দেখার জন্য। সে পুতুলের বিছানার পর্দা সরিয়ে দেখতে পেল, তারা সবাই শুয়ে আছে, কিন্তু আগের দিনের থেকে অনেক বেশি ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সোফি সেই ড্রয়ারটাতেই ছিল যেখানে ইডা তাকে রেখে গেছিল, কিন্তু তাকে দেখে মনে হল তার খুব ঘুম পেয়েছে।

"তোমার কি মনে আছে তোমাকে ফুলেরা আমাকে কি বলতে বলেছিল?" জিজ্ঞেস করল ছোট্ট ইডা। কিন্তু সোফিটা বোকার মত তাকিয়ে রইল, কিছুই বলল না।

"তুমি মোটেও ভাল মেয়ে নও, " বলল ইডা, "তাও ওরা তোমার সাথে নাচ করেছিল।"

তারপরে সে সুন্দর পাখির ছবি আঁকা একটা ছোট্ট কাগজের বাক্স নিল, আর শুকিয়ে যাওয়া ফুলগুলিকে তার মধ্যে শুইয়ে দিল।

"এইটা হবে তোমাদের সুন্দর কফিন," সে বলল; "আর হ্যাঁ, আমার দাদারা যখন বেড়াতে আসবে, ওদের সাথে আমি তোমাদের বাগানে কবর দেব, যাতে তোমরা পরের গ্রীষ্মে আরো সুন্দর হয়ে ফুটতে পার।"

তার দুই খুড়তুতো দাদা ছিল জেম্‌স্‌ আর অ্যাডল্‌ফাস। তাদের বাবা তাদেরকে একটা করে তীর ধনুক কিনে দিয়েছিলেন, আর তারা সেগুলি ইডাকে দেখাতে নিয়ে এসেছিল। সে তাদেরকে শুকিয়ে যাওয়া ফুলগুলির কথা বলল। তারপরে বাবা মায়ের অনুমতি নিয়ে বাগানে ফুলগুলিকে কবর দিতে চলল। আগে আগে চলল দুই ভাই, তীর ধনুক কাঁধে নিয়ে, পেছনে চলল ইডা, সেই শুকিয়ে যাওয়া ফুলে ভরা বাক্সটা হাতে নিয়ে। তারা বাগানে একটা ছোট্ট কবর খুঁড়ল। ইডা তার ফুলেদের আদর করে বাক্সটা মাটিতে পুঁতে দিল। তাদের কাছে কিনা বন্দুক বা কামান কিছুই ছিলনা, তাই জেম্‌স্‌ আর অ্যাডল্‌ফাস কবর দেওয়ার পরে একবার করে তাদের তীর ধনুকই চালিয়ে দিল।

হান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসন এর 'লিট্‌ল ইডা'স ফ্লাওয়ার্স' অবলম্বনে।

অনুবাদঃ
মহাশ্বেতা রায়
কলকাতা

পড়ে পাওয়া: বনের খবর

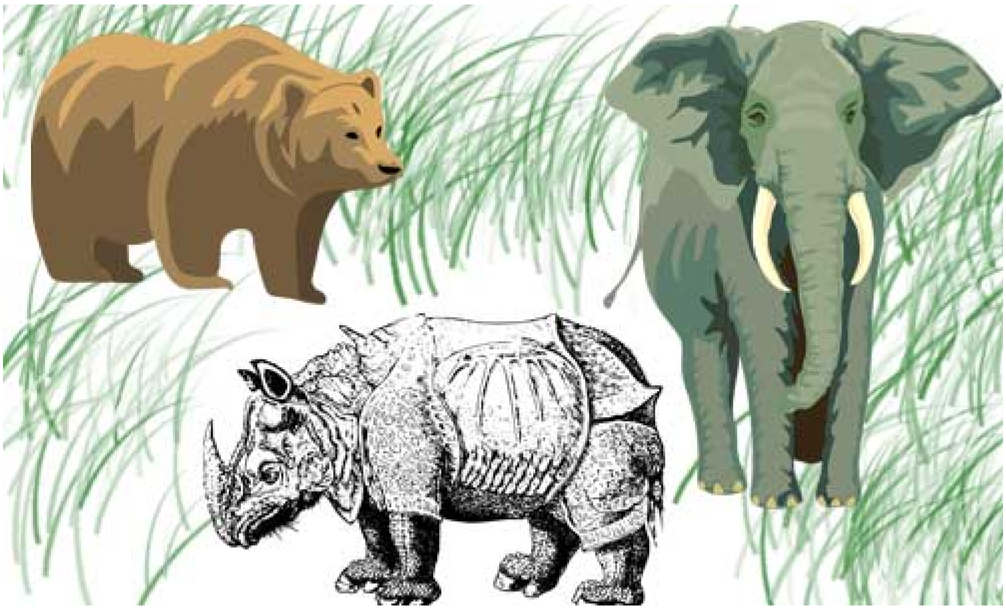

যারা জরিপের কাজ করে, তাদের মধ্যে অনেককে ভারি ভয়ঙ্কর সব জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়। সেই সব জায়গায় হাতি, মহিষ, বাঘ, ভাল্লুক আর গণ্ডার চলাফেরা করে, আবার যেখানে সেই-সব নেই, সেখানে তাদের চেয়েও হিংস্র আর ভয়ানক মানুষ থাকে। প্রায় কুড়ি-বাইশ বছর এইসব জায়গায় ঘুরে কত ভয়ই পেয়েছি, কত তামাশাই দেখেছি।

সরকারি জরিপের কাজে অনেক লোককে দলে দলে নানা জায়গায় যেতে হয়। এক -একজন কর্মচারীর উপর এক -একটা দলের ভার পড়ে। তাঁর সঙ্গে জিনিসপত্র বইবার জন্য, হাতি, গোরু, ঘোড়া, খচ্চর ও উট, আর জরিপ করবার জন্য সার্ভেয়ার, আমিন, খালাসি ও চাকর-বাকর বিস্তর থাকে। বনের মধ্যে থাকতে হয় তাঁবুতে। লোকজনের বাড়ির কাছে থাকা প্রায়ই ঘটে ওঠে না, এক-এক সময় এমনও হয় যে চারদিকে কুড়ি-পঁচিশ মাইলের মধ্যে আর লোকালয় নেই। বন এমনই ঘন আর অন্ধকার যে তার ভিতর অনেক সময় সূর্যের আলো প্রবেশ করে না; চলবার পথ, জঙ্গল কেটে তৈরি করে নিতে হয়, তবে অগ্রসর হওয়া যায়। যদি জানোয়ারের রাস্তা, বিশেষত হাতির রাস্তা, পাওয়া গেল তো বিশেষ সুবিধার কথা বলতে হবে।

এমনি বিশ্রী জায়গা! প্রথম-প্রথম এইসব জায়গায় সহজেই ভয় হত। আমার মনে আছে প্রথম বছর যখন শান স্টেটে যাই, আমার তাঁবুর সামনে বসে একটা বাঘ ফোঁস-ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছিল, আমি তো শুনে বড়োই ব্যস্ত হয়েছিলাম। তারপর, এর চেয়েও কত বড়ো-বড়ো ঘটনায় পড়েছি কিন্তু তেমন ব্যস্ত কখনো হইনি।

কি, আরো পড়তে ইচ্ছা করছে? জানতে ইচ্ছা করছে লেখক আরো কোন কোন বড় ঘটনার সামনে পড়েছেন? জানতে হলে পড়ে ফেল 'বনের খবর', লেখন প্রমদারঞ্জন রায়। আজ থেকে শ'খানেক বছর আগে, প্রমদারঞ্জন রায় ছিলেন একজন অসমসাহসী সার্ভেয়ার। সরকারী জরিপের কাজে তিনি ভারতের

বিভিন্ন প্রান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন প্রায় বাইশ বছর। বাঘ, ভাল্লুক, হাতি, গন্ডার বা ডাকাতদলের মুখোমুখি হওয়া- তাঁর রোমাঙ্ককর অভিজ্ঞতার ভান্ডার বিশাল। বইটি অনেকদিন অপ্রকাশিত ছিল, কিন্তু এই বছর থেকে আবার প্রকাশিত হয়েছে।

বনের খবর
প্রমদারঞ্জন রায়
লালমাটি
৮০ টাকা

ছবিঃ
ইন্টারনেট

পুরাণকথা: দিনেওয়ান আর গুম্বলগাবন

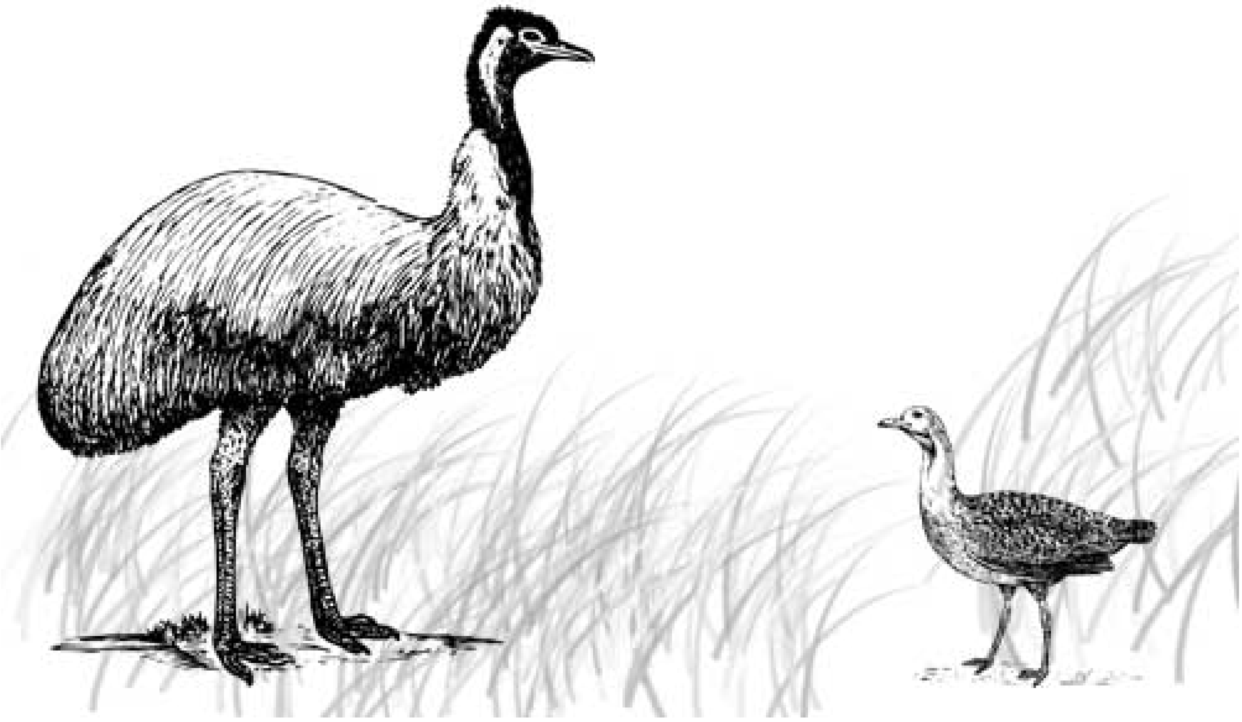

দিনেওয়ান, বা এমু পাখি, সবথেকে বড় পাখি ছিল বলে, অন্য সব পাখিরা তাকে রাজা বলে মান্য করত। গুম্বলগাবন, বা বাস্টার্ড পাখিরা, দিনেওয়ান দের হিংসা করত। বিশেষতঃ গুম্বলগাবন মা, দিনেওয়ান মাকে খুব হিংসা করত। দিনেওয়ানেরা খুব জোরে দৌড়াতে পারত, আর অনেক উঁচুতে উড়তে পারত। এইসব দেখে তার আরো হিংসা হত। আর যখন দিনেওয়ান মা, অনেক উঁচু আর দূর থেকে উড়ে এসে তার সামনে নেমে ডানা ঝাপটাত আর গলা ফুলিয়ে খুশিতে ডাক দিত, তখন গুম্বলগাবন মায়ের বিরক্তির শেষ থাকত না।

গুম্বলগাবন মা সবসময়ে বসে বসে ভাবত সে কিরকম ভাবে দিনেওয়ানের আধিপত্য শেষ করতে পারবে। অনেক ভেবে সে ঠিক করল সে যদি দিনেওয়ানের ডানাদুটিকে নষ্ট করে দিতে পারে আর তার ওড়ার ক্ষমতা শেষ করে দিতে পারে, তাহলে দিনেওয়ানের আধিপত্যও শেষ হবে। কিন্তু সে ভেবে পাচ্ছিল না এই কাজটা কি ভাবে করা যাবে। সে জানত দিনেওয়ানের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করতে যাওয়ার চেষ্টা করা মূর্খামি, কারণ বিরাট বড় দিনেওয়ানের সামনে কোন গুম্বলগাবন টিঁকতেই পারবে না। তাকে কোন একটা চালাকির করে কাজটা করতে হবে।

একদিন, যখন গুম্বলগাবন মা দূর থেকে দেখতে পেল দিনেওয়ান মা তার দিকে এগিয়ে আসছে, সে পা মুড়ে বসে এমনভাবে তার ডানাদুটিকে গুটিয়ে নিল যেন তার কোন ডানাই নেই। দিনেওয়ান এসে তার সঙ্গে গল্পগাছা শুরু করল। খানিক পরে গুম্বলগাবন বলল ঃ তুমি কেন আমার মত ডানাবিহীন হয়ে যাও না? সব পাখিরাই উড়তে পারে। দিনেওয়ানকে যদি পাখিদের রাজা হতে হয়, তাহলে তার ডানা ছাড়াই সব কাজ করতে পারা উচিত। যখন সব পাখিরা দেখবে আমি ডানা ছাড়াই সব কাজ করতে পারছি, ওরা তখন ভাববে আমিই সবথেকে চালাক, আর ওরা তখন একজন গুম্বলগাবনকে রাজা

বানিয়ে দেবে।"

"কিন্তু তোমার তো ডানা আছে," বলল দিনেওয়ান।

"না, আমার কোন ডানা নেই।" বলল গুম্বলগাবন। আর সত্যিই তার ডানাগুলি এত ভালভাবে লুকানো ছিল, যে মনে হচ্ছিল তার কথাগুলি সব সত্যি। দিনেওয়ান একটু পরে চলে গেল, আর অনেক সময় ধরে ভাবতে লাগল। তারপরে সে তার সংগী, দিনেওয়ান বাবার সাথে কথা বলল। সব শুনে দিনেওয়ান বাবাও খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। তারপরে তারা ঠিক করল, তারা কখনই একজন গুম্বলগাবনকে রাজা হতে দেবে না, তার জন্য যদি নিজেদের ডান খোয়াতে হয়, তাও ভাল।

শেষে তারা ঠিক করল, ডানাগুলিকে বিসর্জন দেবে। দিনেওয়ান মা তার সঙ্গীকে বলল একটা পাথরের অস্ত্র দিয়ে তার ডানাদুটিকে কেটে ফেলতে। তারপরে সে তার সঙ্গীর ডানাদুটিকে কেটে ফেলল। ডানা কাটা হয়ে গেলেই দিনেওয়ান মা আর সময় নষ্ট না করে গুম্বলগাবনের কাছে চলে গেল তারা কি করেছে জানাতে। সে ছুটে গেল সেই সমতলে, যেখানে গুম্বলগাবনের সাথে তার দেখা হয়েছিল

গুম্বলগাবন তখনও সেখানে পা মুড়ে বসে ছিল, তাকে দেখে দিনেওয়ান মা বললঃ দেখ, আমিও তোমার মত করেছি। আমার এখন কোন ডানা নেই। সেগুলি কাটা হয়ে গেছে।"

"হা!হা!হা!" হেসে উঠল গুম্বলগাবন, আর তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে আনন্দে নাচতে লাগল, কারণ তার দুষ্টবুদ্ধি সফল হয়েছে। নাচতে নাচতে সে তার ডানাদুটিকে ছড়িয়ে দিল, সেগুলিকে ঝাপটাল, আর বললঃ "এইবার, এইবার তোমাকে বাগে পেয়েছি। আমার ডানাদুটোতো ঠিকই আছে। তোমরা দিনেওয়ানেরা, কি বোকা, যা শোনো, তাই বিশ্বাস কর! তোমরা আবার রাজা হতে চাও! হা! হা! হা!" এই ভাবে উপহাস করে, গুম্বলগাবন নিজের ডানাদুটিকে দিনেওয়ানের নাকের সামনে ঝাপটিয়ে দিল। দিনেওয়ান তাকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য শাস্তি দিতে এগিয়ে এল, কিন্তু গুম্বলগাবন উড়ে পালিয়ে গেল, আর দিনেওয়ান - হায়! ডানাবিহীন দিনেওয়ান আর তার পিছু নিয়ে উড়তে পারল না।

নিজের ভুল বুঝতে পেরে, দিনেওয়ান মা ফিরে গেল, আর ভাবতে লাগল কিভাবে এর প্রতিশোধ নেবে। কিভাবে? সে আর তার সঙ্গী বেশ কিছুদিন ভেবেও কোন উপায় খুঁজে পেল না। কিন্তু তারপরে, দিনেওয়ান মায়ের মাথায় একটা বুদ্ধি এল, আর সে সঙ্গে সঙ্গে সেই কাজ করার জন্য বেরিয়ে পড়ল। সে দু'টি বাদে, তার বাকি সব সন্তানদের একটা বড় কাঁটাঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রাখল। তারপরে সে সেই সমভূমিতে নেমে গেল, সাথে তার দুটি ছানা। গিরিখাতের ওপর থেকে নামতে নামতে সে দেখতে পেল, গুম্বলগাবন তার বারোটা ছানাকে খাওয়াচ্ছে।

সেখানে পৌঁছে, গুম্বলগাবনের সাথে এটা ওটা হাবিজাবি কথা বলে, দিনেওয়ান মা তাকে বলল," তুমি আমাকে নকল করে শুধুমাত্র দুটি সন্তান রাখ না কেন? বারোটা ছানাকে খাওয়ানো কি সোজা কথা! এতগুলো বলেই, তোমার ছানারা কোনদন দিনেওয়ানদের মত বড় হয়ে উঠবে না। যে খাবারে দুটো বড় পাখি তৈরি হতে পারে, বারোটা পাখির তো তাতে খিদেই মিটবে না।" গুম্বলগাবন মা কিছু বলল না, কিন্তু মনে মনে ভাবল, এটা ঠিক কথা হতেও পারে। এটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে দিনেওয়ান ছানারা গুম্বলগাবন ছানাদের থেকে অনেক বড় আকারের হয়। মনের মধ্যে অশান্তি নিয়ে গুম্বলগাবন মা হেঁটে চলল, আর ভাবতে থাকল, সত্যিই কি তার সন্তানেরা সংখ্যায় বেশি বলে আকারে

দিনেওয়ানদের থেকে অনেক ছোট? দারুণ ব্যাপার হবে, সে ভাবল, যদি তার সন্তানেরাও দিনেওয়ানদের মত বড় বড় হয়। কিন্তু তার মনে পড়ল, সে মা দিনেওয়ানের সাথে কি চালাকি করেছিল, আর তার সন্দেহ হল– এবার হয়ত মা দিনেওয়ান তাকে বোকা বানাতে চাইছে। দিনেওয়ানেরা যেখানে ঘুরে ঘুরে খাচ্ছিল, সেইদিকে ফিরে তাকাল সে, আর সে দেখতে পেল দিনেওয়ানের ছানাদুটি তার ছানাদের থেকে কতটা বড়, আর অমনি তার মন আবার প্রবল হিংসায় ভরে গেল। সে ঠিক করল সে কিছুতেই হেরে যাবে না। দরকার পড়লে সে দুটি বাদে তার বাকি সব ছানাদের মেরে ফেলবে। সে বলল,

"দিনেওয়ানেরা কিছুতেই সমভূমির রাজা হতে পারবে না। তাদেরকে সরিয়ে দেবে গুম্বলগাবনেরা। তারা দিনেওয়ানদের মত বড় হবে, আর তাদের ডানাও থাকবে আর তারা উড়তে পারবে, যা এখন দিনেওয়ানেরা পারেনা। "

গুম্বলগাবন মা সোজা গিয়ে দু'টি বাদে তার বাকি সব সন্তানদের মেরে ফেলল। তারপরে সে চলল সেই জায়গায় যেখানে দিনেওয়ানেরা খাচ্ছিল। দিনেওয়ান মা যখন তাকে আসতে দেখল, সাথে মাত্র দুটি ছানা নিয়ে, তখন সে হেঁকে বলল "তোমার বাকি ছানাগুলি কোথায়?"

গুম্বলগাবন মা উত্তর দিল, "আমি তাদেরকে মেরে ফেলেছি, আর মাত্র দুটিকে বাঁচিয়ে রেখেছি। ওরা এখন প্রচুর খেতে পাবে, আর খুব তাড়াতাড়ি তোমার ছানাদের মত বড় হয়ে যাবে।"

"তুমি কি নিষ্ঠুর মা, তুমি নিজের সন্তানদের মেরে ফেললে! তুমি কি লোভী! কেন, আমারো তো বারোটা সন্তান আছে, আর আমি তাদের সবার জন্য খাবার খুঁজে আনি। আমি কোন কারণেই তাদের একজনকেও মারব না, তাতে যদি আমার ডানা ফিরে আসে, তাহলেও না। এখানে সবার জন্য যথেষ্ট খাবার আছে। দেখ এই বেরি গাছটা কেমন আমার বিরাট পরিবারের সবার জন্য ফলে ভরে আছে। দেখ কেমন করে গঙ্গাফড়িংগুলি লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে, যাতে আমরা ওদেরকে ধরে খেতে পারি আর সবল হতে পারি।"

"কিন্তু তোমার তো মোটে দুটি সন্তান!"

"আমার বারোটা সন্তান আছে। আমি গিয়ে তাদেরকে নিয়ে আসছি।" এই বলে দিনেওয়ান মা সেই কাঁটাঝোপের দিকে দৌড়ে গেল যেখানে সে তার দশটি সন্তানকে লুকিয়ে রেখেছিল। একটু পরেই তাকে দেখা গেল ফিরে আসতে। তার গলা সামনের দিকে বাড়িয়ে, তার মাথা গর্বে উঁচু করে, তার ল্যাজের পালকগুলি নাড়াতে নাড়াতে সে দৌড়ে আসছিল, আর অদ্ভূত আনন্দের একটা গান গাইছিল। তার পেছনে পেছনে আসছিল ছোট্ট নরম সাদা কালো পালকে ঢাকা তার সন্তানেরা, নিজেদের মধ্যে কলকল করতে করতে। যখন দিনেওয়ান মা গুম্বলগাবন মায়ের কাছে পৌঁছাল, তখন সে খুব শান্ত গলায় বলল,

"এখন তুমি দেখতে পাচ্ছ আমার কথা সত্যি ছিল, আমার বারোটা সন্তান আছে, যেমন আমি বলেছিলাম। তুমি আমার সন্তানদের দিকে তাকিয়ে নিজের মেরে ফেলা সন্তানগুলির কথা ভাবতে পার। আর এখন আমি তোমার বংশধরদের ভবিষ্যত তোমাকে বলব। তুমি মিথ্যে কথা বলে, চালাকি করে দিনেওয়ানদের ডানা হারাতে বাধ্য করেছ, আর এখন থেকে, যতদিন অবধি দিনেওয়ানেরা তাদের ডানা ফিরে পাবে না, ততদিন অবধি গুম্বলগাবনেরা শুধুমাত্র দুটো করে ডিম পাড়বে, আর তাদের মাত্র দুটো করেই ছানা হবে। আমাদের যুদ্ধের এখানেই সমাপ্তি। তোমার কাছে রইল তোমার ডানা, আর আমার

কাছে আমার সন্তানেরা।"

আর সেই সময় থেকেই, দিনেওয়ান, বা এমু পাখির কোন ডানা নেই, আর গুম্বলগাবন, বা বাস্টার্ড পাখিরা, এক ঋতুতে মাত্র দুটো করে ডিম পাড়ে।

অস্ট্রেলিয়ার উপকথা

ভাষান্তরঃ
মহাশ্বেতা রায়
কলকাতা

ছবিঃ
ইন্টারনেট

স্বাধীনতার গল্প: পর্ব ৩

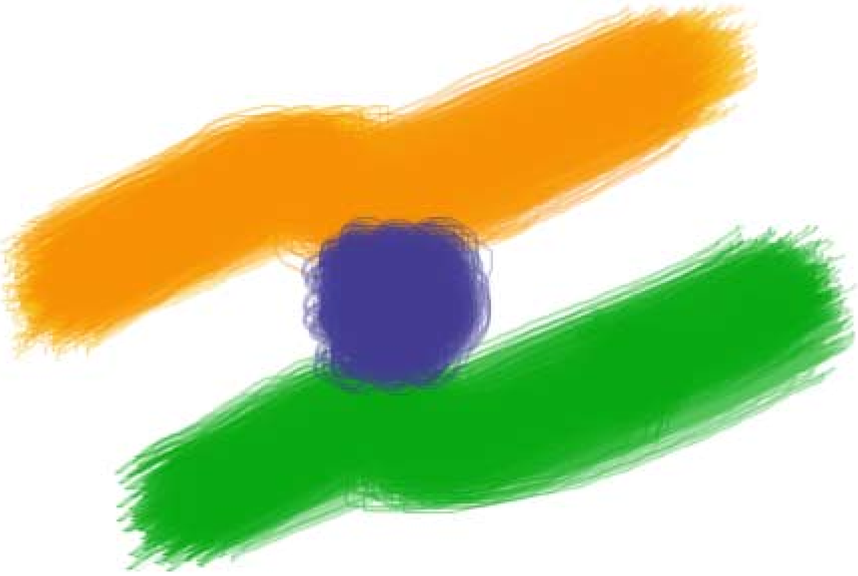

কি বন্ধু কেমন আছ? খুব রঙ খেলেছ তো দোলে? ১৪১৮ সনের নববর্ষ কেমন কাটালে বলো? এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি তোমায় – নববর্ষ কিন্তু ইংরেজী New Year এর মতই গুরুত্বপূর্ণ, হয়তো খানিকটা বেশিই, কারণ আমরা আসলে বাঙ্গালী তো! যতই ইংরেজী মিডিয়াম স্কুলে পড় না কেন, নিজের ভাষা, মাতৃভাষা কে কোনদিন অবজ্ঞা কোরো না কিন্তু। তুমি কি জান, UNESCO নামে একটা বিশ্বসংস্থা বাংলা ভাষা কে 'the sweetest language of all the languages in the world' (বিশ্বের সমস্ত ভাষার মধ্যে সবথেকে মিষ্টি ভাষা) বলে গত বছর ঘোষণা করেছে! যে কোনো ভাষা বেঁচে থাকে তার ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে। শুনলে অবাক হবে যে সারা পৃথিবী তে প্রায় হাজার পাঁচেক ভাষা আছে। আগামী দশ বছরের মধ্যে প্রায় দু'হাজারের বেশি ভাষা শুধু ব্যবহারের অভাবে অবলুপ্ত হয়ে যাবে। মনে রেখো যে আমাদের দেশের মণীষীরা ইংরেজী তে দড় ছিলেন বটে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই, বাংলা ভাষা, মাতৃভাষা কে অবজ্ঞা করে নয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত-র কথা তো তুমি জানই। ঈংরেজি ভাষার মোহে অন্ধ হয়ে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন। চৌকস ছিলেন ইংরেজীতে। বহু ইংরেজ লেখকও তাঁর কাছে ম্লান। কিন্তু মাতৃভাষা নয় বলে যথেষ্ট মর্যাদা পেলেন না। নিজের ভুল বুঝতে পেরে লেখা শুরু করলেন মাতৃভাষা বাংলায়।তারপর তাঁকে আর আটকানো যায় নি।

যাই হোক, তুমি কিন্তু কখনই নিজের মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা কোরো না। কেউ হাসাহাসি করলে তাদেরকে বোঝাবে তুমি যে সারা পৃথিবীতে পাঁচ হাজার ভাষার মধ্যে বাংলা কিন্তু মাত্র ছ' নম্বরে, আর ইংরেজি কিন্তু তিন এ, প্রথমে নয়।ইংরেজি কিন্তু একটা বিশ্বব্যাপি ব্যবহৃত ভাষা বা Global Language হয়েও তিন নম্বরে আর বাংলা সেখানে একটা স্থানীয় ভাষা বা Local Language হওয়া সত্ত্বেও মাত্র ছয় নম্বরে রয়েছে। বাঙ্গালী হিসেবে গর্ব হচ্ছে না তোমার? আমার ত' হচ্ছে!

ঠিক এই রকম গর্ব আমার হয় বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলার কথা ভাবলে। আওরঙ্গজেব তো ১৭০৭ সালে দেহ রাখলেন। মুঘাল সাম্রাজ্যের বাঁধন ভেঙ্গে পড়ল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের সাথে হাত মিলিয়ে ভারতের নান প্রান্তে চুটিয়ে ব্যবসা করছে আর বাধা এলেই নানান ষড়যন্ত্র

করে দখল নিচ্ছে সামন্ত রাজাদের। সৈন্য-সামন্ত, অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ছোটখাটো যুদ্ধও চালিয়েই যাচ্ছে।

তোমাকে তো আগেই বলেছি যে ইংরেজদের ঘাঁটি ছিল কলকাতায়। বাংলার নবাব তখন সিরাজদ্দৌলা। তিনি আবার ইংরেজ বণিকদের ঔদ্ধত্য আর স্বেচ্ছাচারিতা একদম পছন্দ করতেন না। ১৭৫৬ সালে ইংরেজদের শায়েস্তা করার জন্য সিরাজ বিশাল বাহিনী নিয়ে কলকাতা আক্রমণ করেন আর নিমেষে তার দখল নেন।

নবাব সিরাজদ্দৌলা

ইংরেজ বণিকদের সে দিনই শেষ দিন ছিল যদি না মীরজাফর থাকতেন।সিরাজের প্রধান সেনাপতি মিরজাফরই সেদিন ইংরেজ প্রধাণ সেনাপতি লর্ড ক্লাইভ ও তাঁর অনুচরদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে দেন।শুরু হয় এক নতুন ষড়যন্ত্রের ইতিহাস। লর্ড ক্লাইভ বোধ হয় নিজেও জানতেন না যে আগামী এক বছরের ষড়যন্ত্র সারা ভারতের ইতিহাস কে দু'শ বছরের জন্য বদলে দিতে চলেছে।

লর্ড ক্লাইভ

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ – ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয় আমার। একটা আম বাগানে সামান্য একটা যুদ্ধ, যার নিয়তি নিয়ে কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ইংরেজ সেনাপতি লর্ড ক্লাইভ-এর অধীনে মাত্র হাজার তিনেক সৈন্য, যাদের মধ্যে আবার মাত্র আটশ' জন হল ইউরোপীয়। আর লর্ড ক্লাইভ-এর সহযোগী এডমিরাল ওয়াটসন। সিরাজের সৈন্য সে তুলনায় বিশালঃ শুধু ঘোড়সওয়ারই ছিল আঠারো হাজার, ছিল পঞ্চাশ হাজার পদাতিক। নবাব সিরাজের হারের কোন কারণই নেই; তিনি অতি বড় দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি যে এই যুদ্ধ তিনি হারতে পারেন।

কিন্তু সিরাজই হারবেন। ষড়যন্ত্র যে সে রকমই।ষড়যন্ত্রের প্রধাণ উদ্যোক্তা, সিরাজের প্রধান সেনাপতি মীরজাফর নিজের দলে টেনেছেন জগত শেঠ আর উমীচাঁদ নামে প্রবল প্রতাপশালী দুই শ্রেষ্ঠী কে। ইংরেজ বণিকরা আমাদের দেশের লোকের লোভকে ব্যবহার করে যে যুগান্তকারী পরাধীনতার ইতিহাসের ভূমিকা সুনিশ্চিত করেছিল, তা পৃথিবীর ইতিহাসেও বিরল। তাই তো পলাশীর যুদ্ধের এত গুরুত্ব। এই যুদ্ধের ফলাফল বলতে গেলে আমার গলা বুজে আসে। পলাশীর আমবাগানে হয়েছিল এই যুদ্ধ। এখন সেখানে বেড়াতে গেলে পাবে শুধু একটা আমগাছ আর চাষের ক্ষেত। তার মাঝখানে অনেক খুঁজলে কোনোমতে একটা স্মৃতিফলক পাবে। ব্যাস।

পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে ক্লাইভ এবং মীরজাফর

কি হল তার পর?
সেটা বরং পরের সংখ্যায় বলব।ভাল থেকো কিন্তু।

আর্য চ্যাটার্জি
কলকাতা

ছবিঃ
ইন্টারনেট

শিল্পের ইউরোপ: পর্ব ৩

১ - প্যারিসের মাটিতে নামবার আগে আকাশ থেকে যে দুটো মনুষ্য নির্মিত ইমারত চোখে পড়বে তার মধ্যে প্রথম হল স্বনামধন্য আইফেল টাওয়ার। দ্বিতীয় হল "লা ইনভালিডস"-এর সুবিশাল সোনালী গম্বুজ।

২ - লা ইনভালিডস তৈরী হয় ১৬৭৯ সালে বৃদ্ধ বৃদ্ধা এবং আহত সৈনিকদের হাসপাতাল হিসেবে। পরবর্তীকালে এই খানেই স্থান পায়ে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট-এর সমাধি। রোমের সেন্ট পিটার'স ব্যাসিলিকা-র অনুকরণে তৈরী, "এগ্লিসে ডু ডোমে" নামেও পরিচিত এই কীর্তিস্তম্ভ ফরাসী baroque

শিল্পের এক অনন্য উদাহরণ।

৩ - মেরি ম্যাগডালীন-এর স্মৃতিতে বানানো এই চার্চ-এ বছরের ৫২ সপ্তাহের রূপক হিসেবে রয়েছে ৫২ টি স্তম্ভ।

৪ - প্যারিস-এর ল্যুভর্‌ মিউসিয়ামের তলায়ে রয়েছে এই বিখ্যাত কাঁচের উল্টো পিরামিড যা এসে মিলছে এক ছোট্ট সোজা পিরামিড-এর মুখোমুখি। ড্যান ব্রাউন-এর উপন্যাস 'দা ভিঞ্চি কোড' -এ আমরা "ব্লেড অ্যান্ড চ্যালিস" নামে পরিচিত এই শিল্পকীর্তির উল্লেখ পাই আর তিনি কল্পনা করেছেন যে এই ছোট্ট পিরামিড টা আসলে মাটির নিচে আরেকটি পিরামিড-এর শিখরাংশ এবং এই নীচের পিরামিড এর ভেতরে আছে যীশু খ্রিষ্টের স্ত্রী মেরি ম্যাগডালীনের আসল সমাধি।

৫ – ওবেলিস্ক ডে লাক্সার। ৩৩০০ বছর আগে এই ওবেলিস্ক মিশরে লাক্সার মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে শোভিত ছিল। মিশরের রাজা ফ্রান্স কে উপহার দেন ৫৫৫ ফিট উঁচু এই সুবিশাল ওবেলিস্ক। ভাবতেই অবাক লাগে, তখনকার যুগে কি করে নিয়ে আসা হয়েছিল এই সুউচ্চ প্রস্তর নির্মিত স্তম্ভ, এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে।

৬ – লুসার্নের “লায়ন মনুমেন্ট”। ১৭৯২ সালের ফরাসী বিপ্লবের সময় ৭০০ সুইস গার্ডের স্মারক হিসেবে বেরথেল থরওয়াল্ডসেন এই মুর্তি নির্মান করেন পাথর কেটে এক পাহাড়ের গায়ে। এই ৭০০ জন বীর সৈনীকরা জানতেন না যে যাদের বাঁচাবার জন্যে তারা লড়াই করছেন, সেই রাজা ষোড়শ লুই, মেরি অ্যান্টয়নেট ও তাদের সন্তানদের নিয়ে ততক্ষণে পলায়ন করেছেন তাদেরকে না জানিয়েই। এই পিঠে ছুরি মারার মতন কাজের তীব্র নিন্দা করেন এবং তারই উপমা হিসেবে শিল্পীর এই দুখী সিংহের পিঠে একটা ভাঙ্গা বর্শা গেঁথে দেন।

৭ – ইউরোপের সব থেকে সুন্দর "স্কোয়ার" হল ব্রাসেল্‌সের "গ্র্যান্ড প্লেস"। অসাধারণ এই শহরের আধুনিকতার বেড়া টপকে এখানে এলে মনে হবে সপ্তদশ শতাব্দীতে চলে এসেছি। অপুর্ব সুন্দর সুপ্রাচীন

ক্যাথিড্রাল গুলোর গায়ে গায়ে অমুল্য সব শীল্পের নিদর্শন রয়েছে যা আমরা আগামী দুটো ছবিতেও দেখতে পাব।

৮ ও ৯ – ব্রাসেল্‌সের ক্যাথিড্রালের গায়ে শীল্পকীর্তি।

১০ – "ম্যানেকিন পিস" নামক এই শিশুর প্রস্রাবরত মুর্তি ব্রাসেল্‌সের চিহ্ন হয়ে গেছে। ১৩৮৮ সালে এই মুর্তি নির্মান করা হয়। এই মুর্তির একটি ইতিহাস হল, যখন জার্মান সেনারা বেলজিয়ামে এসে ত্রাসের সৃষ্টি করে, সব লোকেদের ওপর জুলুম চালায়ে, তখন এক ছোট্ট বালক এক বারান্দা থেকে সেই সেনাদের মাথায়ে প্রস্রাব করে। এটা তখনকার বেলজিয়ামের দুঃসাহসিকতার এক চিহ্ন হিসেবে দেখে অনেক মানুষ। তাই আজও সবাই এক নামে চেনে এই ম্যানেকিন পিস-কে।

১১ – এভেরার্ড টে সের্ক্লায়েস-এর শায়িত মুর্তি। এই মুর্তি তামার তৈরী। ব্রাসেল্‌সের মানুষেরা বিশ্বাস করেন যে এই মুর্তিকে ছুঁলে তা সৌভাগ্য নিয়ে আসে। তাই এখানে যেই আসে সেই ছুঁয়ে দেখে এই মুর্তি, পায়ের ধারের সারমেয়টিকে, এবং পরীর মুখটি। বাকি নির্মান পুরো তামার হলেও, মানুষের নিত্য স্পর্শ করা অংশগুলি তাই চকচকেই থেকে গেছে।

লেখা ও ছবিঃ
ঋতম ব্যানার্জি
কলকাতা

বায়োস্কোপের বারোকথা: সিনেমা জগতের নতুন অভিজ্ঞতা

(গত সংখ্যার পর)

বাংলা ছবির দুনিয়ায় 'উদয়ের পথে' এক অত্যন্ত দামি মলাটবদল এই কারণে যে, এই ছবিতে প্রথম বড়লোক মিল/ কারখানা মালিকের মেয়ের সঙ্গে অতি সাধারণ শ্রমিক নেতার ভালবাসার গল্প দেখান হল। এই প্রথম, আমরা পর্দায় অন্তত ধনী-গরিবের পার্থক্য তুলে দিলাম। আজ পর্যন্ত যেকোন জনিপ্রয় ছবিতে এই একই কথা বলা হয় - যে ভালবাসায় টাকার দাম থাকেনা।

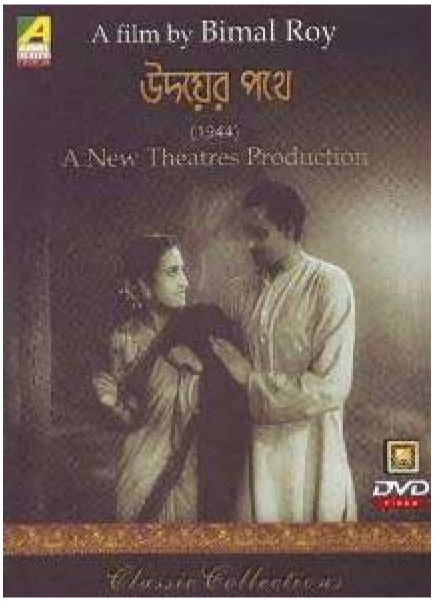

উদয়ের পথে

এই ধারণার মডেল ছবি এই 'উদয়ের পথে'। তাছাড়া ছবিতে এসে গেছিল বাইরের শ্রমিক অশান্তি; ছবিতে দেখা গেল ট্রেড ইউনিয়নের অফিস ঘরে কার্ল মার্ক্স এ ছবি ঝুলছে। চলচ্চিত্র আর শুধু স্বপ্নের উপাখ্যান রইল না, তার মধ্যে অল্প অল্প করে দেখা দিতে লাগল বাস্তব।

এর পরে আমাদের নাম করতে হবে বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর পরিচালিত 'কল্পনা' ছবিটির। যদিও ছবিটির ভাষা হিন্দি, কিন্তু ছবিটি কলকাতায় তৈরি হয়েছিল আর উদয় শঙ্করের ম্যাজিক ছোঁয়ায় নাচ

সেখানে নিজেই গল্প বলতে পেরেছে। যাঁরা নিরীক্ষামুলক ছবির কথা ভাবেন, তাঁদের কাছে এ এক মস্ত কৃতিত্ব।

উদয়শঙ্করের কল্পনা

আর, এর পরেই, ১৯৫১ সালে এল 'ছিন্নমূল'। এই প্রথম, জীবন প্রায় দলিলের মত উঠে এল ছবিঘরে। উদ্বাস্তু জীবনের অভিশাপ ও কান্নার বিবরণ দেওয়ার সময়ে পরিচালক নিমাই ঘোষ কোন রকম আপোস রফা করেন নি। মাত্র ১০,০০০ ফুটের এই ছবিটি আজ পর্যন্ত শহুরে উদ্বাস্তুর দুর্দশার সবচেয়ে প্রামাণ্য বর্ণনা। এই ছবির অভিনেতারা চলচ্চিত্রের পেশাদার অভিনেতা ছিলেন না। তাঁরা অনেকেই নাটকের কর্মী। তাঁদের অভিনয় দক্ষতা ছিল অবাক হয়ে যাওয়ার মত। এই ছবির ক্যামেরার কারিকুরী তো মুগ্ধ করে দেয়। এজন্যই বিখ্যাত সোভিয়েত পরিচালক পুদভকিন নিজে সে যুগের রুশ পত্রিকা প্রাভ্‌দায় ছিন্নমূলের একটি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। নিমাই ঘোষের বাজেট ছিল অত্যন্ত কম, এত কম যে তাঁকে প্রায় প্রতিটি প্রথম শট্‌কেই ওকে শট্‌ বলে মেনে নিতে হয়েছে। রিটেক করার সুযোগ পান নি। তবুও অপরিসীম নিষ্ঠায় তিনি আমাদের সিনেমার ভাষায় জীবনের প্রত্যক্ষ ছাপ এঁকে দিলেন।

ইতিমধ্যে আরো কয়েকটি ঘটনা ঘটল যা আমাদের ছায়াছবিকে সাবালক করে দিল ৫০ দশকের গোড়াতেই। প্রথমেই বলতে হবে পৃথিবীর দুই দিকপাল পরিচালক ফ্রান্সের রেঁনোয়া ও রুশদেশের পুদভকিনের কলকাতা সফরের কথা। এতদিন অবধি আমরা ছবি বলতে বুঝতাম আমেরিকার হলিউড ঘরানার ছবি। আর নয়ত এই সব ছবিকে নকল করে তৈরি করা বাংলা বা হিন্দি ছবি। এই দুজন বড় পরিচালক আমাদের তরুণ চলচ্চিত্রকর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের জানালেন যে ছবি অন্যরকম ভাবেও করা যায়। কিভাবে আমাদের আশেপাশের ঘটে চলা সত্যিকারের ঘটনাগুলিকে ব্যবহার করে ছবি নানাধরনের গল্প বলতে পারে, সে খবর আমরা জানলাম এই দুই স্রষ্টার সঙ্গে কথা বলে, তাঁদের সাক্ষাতকার পড়ে।

সিনেমা মানেই যে শুধু হলিউড নত, আলাদা ভাবেও গল্প বলতে পারে, সেটা জানা কম কথা নয়।

জঁ রেঁনোয়া আর সেভোলোদ পুদভকিন

তরুণ চলচ্চিত্র উতসাহী ঋত্বিক ঘটক আর সত্যজিত রায় এই দুজনের কাছ থেকে নানা রকমের অভজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। আর নের পরেই হয় সব থেকে বড় এক অভিজ্ঞতা - ১৯৫২ সালে স্বাধীন ভারতে প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উতসব। সেকথা বলব এর পরের বার।

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক
চলচ্চিত্র বিদ্যা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ছবিঃ
ইন্টারনেট

ছবির খবর: ট্যাঙ্গেলড্‌

অনেক অনেক দিন আগে, এক ফোঁটা সূর্যের আলো এসে পড়েছিল পৃথিবীর বুকে। সেই আলো থেকে জন্মালো এক জাদু গাছ। সেই গাছে ফুটল এক সূর্যের মত সোনালি ফুল। সেই ফুলের ছিল এক আশ্চর্য ক্ষমতা। সময়ের কাঁটাকে ঘুরিয়ে দিতে পারত সেই ফুল - যে কোন পুরানো জিনিষ তার ছোঁয়ায় হয়ে উঠত নতুন, যে কোন ক্ষত সেরে যেতে পারত এক নিমেষে, মৃত্যুর মুখ থেকে প্রাণ ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারার ক্ষমতা ছিল সেই ফুলের।

কিন্তু, সেই ফুলটাকে আর কেউ খুঁজে পাওয়ার আগেই, সেটা মাদার গথেল নামে এক দুষ্টু বুড়ির চোখে পড়ে গেল। বুড়ি সেই গাছটাকে একটা চুপড়ি দিয়ে চাপা দিয়ে রাখল। তার চামড়া যখন কুঁচকে বিবর্ন হয়ে যেত, চোখের দৃষ্টি হয়ে যেত ধূসর, কালো চুল হয়ে যেত শনের নুড়ির মত, সে তখন চুপিচুপি সেই ফুলের কাছে এসে গাইত এক ছোট্ট গান। গান শুনে ফুলের থেকে বেরোত সূর্যকিরণের মত জ্যোতি, সেই জ্যোতির স্পর্শে গথেলের কুঁচকানো চামড়া হয়ে যেত মসৃণ, চোখের দৃষ্টি হত উজ্জ্বল, সাদা চুল হয়ে যেত কালো। এক ধাক্কায় গথেলের বয়স কমে অর্ধেক হয়ে যেত। এইভাবে বছরের পর বছর ধরে, মাদার গথেল নিজের বয়স কমিয়ে রেখে রেখে বেঁচে থাকার আনন্দ উপভোগ করছিল।

সেই দেশে রাজত্ব করতেন এক খুব ভাল রাজা আর তাঁর ভালমানুষ রানী। রানী যখন সন্তানসম্ভবা, তখন তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বাঁচার আর কোন আশা রইল না। সৈন্য সামন্তরা ছড়িয়ে পড়ল দেশের আনাচে কানাচে, খুঁজে বার করতে চাইল রানীকে সুস্থ করে তোলার কোন না কোন উপায়। আর তারা একদিন খুঁজে পেল সেই সোনালি ফুল। সেই গাছ তুলে নিয়ে এল তারা। আর সেই ফুল ভেজানো জল খেয়ে সুস্থ হলে রানী। জন্ম দিলেন সূর্যের সোনালি কিরণের মত সোনালি চুলের এক ফুটফুটে রাজকন্যার। রাজা আর রানী নতুন রাজকন্যার জন্মদিন উপলক্ষ্যে ওড়ালেন রঙিন ফানুস। সারা দেশ আনন্দে মেতে উঠল।

কিন্তু এই আনন্দ বেশিদিন সইল না। এক রাতে, আবার বয়স বেড়ে যাওয়া মাদার গথেল রাজপ্রাসাদে ঢুকল। সে রাজকন্যার সামনে গিয়ে ফিস ফিস করে গাইল সেই গান - আর রাজকন্যার চুল থেকে ঠিকরে পড়ল সোনালি দ্যুতি। সেই দেখে গথেল রাজকন্যার চুল একটুখানি কেটে নিল। কিন্তু যাঃ - কাটা মাত্র সেই চুল রঙ পালটে হয়ে গেল খয়েরি! তার আর কোন যাদুশক্তি রইল না। মাদার গথেল বুঝতে পারল, এক টুকরো চুলের গোছা দিয়ে তার কাজ হবে না। তাই সে রাজকন্যাকে চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেল। রাজ্যের থেকে অনেক দূরে, গভীর জঙ্গলের মধ্যে, একটা অনেক উঁচু গম্বুজের মধ্যে সে তাকে লুকিয়ে রাখল। সে লুকানো গম্বুজের ভেতরে থেকে বড় হতে থাকল রাজকন্যা –নাম তার রাপুনজেল্। তার একমাত্র সঙ্গী পাস্কাল নামের এক গিরগিটি।

আরে, এত অবধি পড়ে তুমি নিশ্চয় বলবে - এত তো রাপুনজেল্‌ এর গল্প, এটাতো আমি জানি। হ্যাঁ, এটা আমাদের সেই খুব চেনা গল্পটাই, কিন্তু একটু অন্য রকম ভাবে বলা হয়েছে। পুরোনো রাপুনজেলের গল্পে এক রাজপুত্র আসে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার জন্য; কিন্তু এই গল্পে - রাপুনজেলের দেখা হয় এক দুঃসাহসী চোরের সাথে।

সেই চোরের সাহায্য নিয়ে রাপুনজেল গম্বুজ থেকে বেরিয়ে দেখতে যায় প্রতিবছর তার জন্মদিনে দূর আকাশে ভেসে ওঠা রঙিন ফানুসগুলিকে। পথে আসে নানারকমের বিপদ।

কিন্তু চোর ইউজিন আর রাজপ্রাসাদের ঘোড়া ম্যাক্সিমাসের সাহায্যে রাপুনজেল সব বিপদ কাটিয়ে বেরিয়ে আসে। আর সে খুঁজে পায় তার আসল বাবা মাকেও।

এই ছবির নাম 'ট্যাঙ্গেল্‌ড্‌'। রাপুনজেলের এই গল্পটিকে নতুন ভাবে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছেন ওয়াল্ট ডিজনি পিকচার্স। ওয়াল্ট ডিজনি অ্যানিমেশন স্টুডিওর এটা পঞ্চাশতম অ্যানিমেটেড ছবি।

তাহলে আর কি? সময় নষ্ট না করে যোগাড় করে ফেল এই ছবির একটা ডিভিডি। আর গরমের ছুটিতে দুপুরবেলায় রাপুনজেল আর তার সোনালি চুলের সাথে তুমিও হারিয়ে যাও রূপকথার দুনিয়ায়।

মহাশ্বেতা রায়
কলকাতা

দেশে-বিদেশে

বসন্ত তার গান লিখে যায়

এখন যে আইআইটি খড়গপুরকে আমরা দেখি প্রাক স্বাধীনতার যুগে সেখানে ছিল হিজলী জেল। ব্রিটিশ শাসক এই জেলখানায় প্রধানত: রাজনৈতিক বন্দীদের রাখত। সেখানে বাংলার দুই স্বাধীনতা সংগ্রামী সন্তোষ মিত্র এবং তারকেশ্বর সেনগুপ্ত বীরত্বের সাথে শহীদ হয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই জেলখানাটি ইউ এস এয়ারফোর্স এর ভেরি হেভি বম্বার কমান্ডের হেড কোয়ার্টার ছিল। আই-আই-টি ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে দক্ষিণদিকে যাত্রা করলে হিজলি ফরেস্ট শুরু হয়। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট সেখানে সারেসারে ইউক্যালিপ্টাস আর সোনাঝুরি লাগিয়েছে।

এই কৃত্রিম অরণ্যে বুনো গন্ধটা কিছুটা পানসে লাগে।তবে হিজলি ফরেষ্টের সোনাঝুরি-ইউক্যালিপটাসের প্রাক-বাসন্তী দোলা দেখতে মন্দ লাগেনা। আর যদি হয় শীতের শেষ রোববারের সকাল তাহলে এই অরণ্যের হাত ধরে, কেশিয়াড়ি হয়ে ঘুরে আসা যায় ভসরাঘাট যেখানে সুবর্ণরেখা নদীর ধবধবে সাদা, মসৃণ ও রোদের আলোয় চিকচিকে বালির চরে হেঁটে নদীকে ছুঁয়ে দেখে আসা যেতেই পারে।

নদী দেখে ফেরার পথে বেলদার রাস্তায় ২ কিলোমিটার গেলে পড়বে কুকাই গ্রাম। সেখান থেকে আরো ২ কিলোমিটার গেলে পড়বে গগনেশ্বর গ্রামে কুরুম্বেরা দুর্গ।

পুরাতাত্ত্বিক মনুমেন্ট হিসেবে স্বীকৃত এই দুর্গটি সত্যি সত্যি এখনো স্বমহিমায় তার রাজকীয়তা বজায় রেখেছে।

হিজলী জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গেলাম আমরা। তখন শীতের কিছুটা রেশ রয়েছে। গোপালী গ্রাম পড়ল। একদা জনমানব শূন্য এই গ্রাম দ্রুত শহরায়নের স্বীকার হয়েছে বোঝা যায়। আছে কম্পিউটার সেন্টার। এই জায়গাটি এয়ারফোর্সবেস সালুয়ার অন্তর্গত। ইএফআর হেডকোয়ার্টার এই সালুয়া। যাওয়ার সময় আমাদের বাঁদিকে পড়ল সালুয়া আর উল্টোদিকের রাস্তা ধরে গেলে পড়ে কলাইকুন্ডা বিমানবন্দর, যেখানে ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানী বিমান হানা দিয়েছিল। কথিত আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান যাওয়ার পথে, বিদ্ধংসিকারী এটম বোমাবাহী যুদ্ধ বিমান এখানে একটি রাতের জন্য অবতরণ করেছিল । রানওয়ে এখনো আছে।এখন প্লেন নামেনা এখানে কিন্তু এটি পূর্ব ভারতের সমস্ত রেডার সিগন্যাল মনিটারিং সেন্টার। সালুয়ার জনসংখ্যার শতকরা ৯৫ভাগ মঙ্গোলয়েড অর্থাত নেপালী, ভুটিয়া ইত্যাদি অরিজিনের।

ল্যাটেরাইটের সিঁদুর মাটি, ধূধূ ধানজমির সবুজ আর রোদ ঝলমলে শেষ শীতের রেশ নিয়ে কেশিয়াড়ির পথে পা বাড়ালাম। প্রথমে পড়ল মহিষামুরা গ্রাম তারপর খাজরা। পুরোণো উচ্চবিদ্যালয়ে তখন স্পোর্টস হচ্ছিল। "পল্লীপ্রাণ ক্লাব" ছিল সেখানে। সাড়ম্বরে বিবেক-মেলা হচ্ছিল খাজরার মাঠে। পথে অনেক ছোটবড় স্কুল দেখলাম। আদিবাসী অবৈতনিক বিদ্যালয় থেকে শিশু বিদ্যালয় ও উচ্চমাধ্যমিক গার্লস

স্কুল। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে মেদিনীপুর জেলার স্বাক্ষরতা কেন এত বেশী তা বুঝতে পারলাম। অনেক গুলো দীঘি পড়ল পথে। নারকোল আর খেজুরগাছের ছায়া সুনিবিড় সবুজ জলে নামার ইচ্ছে সংবরণ করতে হল। চওড়া পিচের রাস্তার পর শুরু হল সরু রাস্তা। এত সরু যে একটি গাড়ি চললে আর উল্টোদিক দিয়ে গাড়ি এলে নেমে যেতে হবে মাটিতে। আবার জঙ্গল। এবার বাঁশঝাড়ের পর বাঁশঝাড়। মাঘের শেষে সজনে ফুলের গন্ধ তখন বাতাসে।

আর মাইলের পর মাইল ধান জমি। কোথাও কাটা হয়েছে ধান।
কোথাও বা ইরিগেশন ক্যানালের জলে ভেজানো ধানক্ষেতে হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে দলবেঁধে ধানচারা লাগাচ্ছে চাষীবৌ'রা।

এল দুধেবুধে গ্রাম আর দুধেবুধে প্রাথমিক বিদ্যালয়। ইলেকট্রিক পৌঁছে গেছে এখানে। ক্রিশ্চান মিশন

রয়েছে। এল কেশিয়াড়ি বাজার। ঘিঞ্জি রাস্তায় বসেছে রবিবারের হাট।। পেরোলাম নছিপুর গ্রাম। কিছুপরেই পৌঁছলাম ভসরাঘাট, সুবর্ণরেখা নদীর চরে। যাত্রীবোঝাই বাস নামাচ্ছে যাত্রীদের। কোনো স্থায়ী সেতু হয়নি এখনো। অর্ধসমাপ্ত, অস্থায়ী ব্রিজের কাছাকাছি গাড়ি রেখে হেঁটে নদীকে দেখতে গেলাম। কিছু কষ্ট করে সেই বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে মানুষ জন পারাপার হয় এখানে প্রতিদিন। মালবওয়ার জন্য ঢুলি পাওয়া যায়।সুবর্ণরেখা শীতে অনেকটাই রুক্ষ।

কিন্তু বর্ষাকালে এখানে আসাটা খুব সুবিধে হবেনা। তাই শীতের শেষে আসা। নদীর সাদা ও মসৃণ বালির চরে রোদ পড়েছে আর চকচক করছে বালিকণা। সুবর্ণরেখা বয়ে চলেছে আপনমনে। জল বড় কম নদীতে । মাঝিমল্লারা নৌকা নিয়ে আসাযাওয়া করছে, মাছ ধরতে যাচ্ছে। কেউ পারাপার করছে। ওপারে নয়াগ্রাম ।হাওয়ায় তখন বসন্ত এসেছে। একটাদুটো কোকিলও ডাকছে গ্রামের মাটির কুঁড়ের লাগোয়া সজনেগাছে।

নদীকে দেখা হল, ছোঁয়া হল আর তাকে ভালো থাকতে বলে কেশিয়াড়ির পথেই ফিরতে এলাম। কিছুটা ফেরত এসে ডান দিকে বেলদার পথে বাঁক নিলাম। কেশিয়াড়ি গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মাইল চারেক গেলেই পড়বে কুরুম্বেরা দুর্গ। সূর্য তখন মাঝ আকাশে। পেরোলাম দাসিসরিষা, কদমকুঁড়ি ও কুকাইগ্রাম। কুকাইয়ের পথে ২ কিলোমিটার মোরামের রাস্তা ধরে সোজা পৌঁছলাম গগনেশ্বর। . বাইরে বিশাল উঁচু প্রাচীর পরিবেষ্টিত দুর্গটি দশ ফুট উঁচু এবং বিশাল মাঠের মধ্যিখানে প্রায় ৩০ বিঘে স্থান জুড়ে এই দুর্গ।

পাথর দিয়ে কেটে কেটে তৈরী। যেন চক মিলোনো রাজপ্রাসাদ! একদিকে উঁচুতে নাটমন্দিরে তিনটি মন্দিরের গড়নে স্থাপত্য রয়েছে।

এর মধ্যে একটি শিব মন্দির আছে। ওড়িয়া লিপি থেকে জানা যায় ১৪৩৮-১৪৬৯ সালে তৈরী হয়েছিল এই দুর্গটি। ছমছমে দুর্গপুরীর নাম "কুরুম্বেরা"।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সরকারের ওয়েব সাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ও পোষ্ট করা ছবি দেখেই আকৃষ্ট হয়ে আসা এখানে। সত্যিই অভিনব এই দুর্গের স্থাপত্য। ১৯৫৮ সালে আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এই কুরুম্বেরা দুর্গকে পুরাতাত্মিক মনুমেন্ট হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

একটি প্রাচীন মসজিদও আছে এখানে যেটি মহম্মদ তাহির নাকি বানিয়েছিলেন ঔরঙ্গজেবের আমলে ১৬৯১ সালে (পাথরে খোদাই করা লেখা থেকে জানা যায়) ।পশ্চিম মেদিনীপুরে যে এত অভিনব একটি স্থাপত্য আছে তা হয়ত অনেকেরই জানা নেই। নেই কোনো সময়ের দলিল, কোনো সরকারি নথি কিম্বা কোনো কিম্বদন্তীর কড়চা! হয়ত ভবিষ্যতের পাতা থেকে মুছেও যাবে একদিন কুরুম্বেরার দুর্গ। কিন্তু আমাদের ক্যামেরায় আর উইকিম্যাপিয়াতে থেকে যাবে এর ঐতিহ্য!

খড়গপুরের ক্যাম্পাস থেকে রেলওয়ে কলোনি ধরে খড়গপুর স্টেশনের দিকে গিয়ে চৌরঙ্গীর মোড় পেরোলে পড়বে ন্যাশানাল হাইওয়ে ৬। তাকে পেরিয়ে স্টেট হাইওয়ে ধরে বিষ্ণুপুর-বাঁকুড়ার পথ ধরে ঘুরে আসা যেতেই পারে মন্দিরময় পাথরা গ্রাম। বসন্তের বাতাসে সজনে ফুলের গন্ধ নিয়ে আমরা পেরোলাম কংসাবতী নদীর ব্রিজ। শীতে শীর্ণ কাঁসাই নদীর চোখের জল শুকিয়ে গেছে। সাদা বালির চরে রোদের আলো পড়ে তখন চিকচিক করছিল। কিন্তু নদীতে জলের অপ্রতুলতা মোটেই কাম্য ছিল না। মেদিনীপুরের পথ, পাথরার রাস্তা খুব ভাল। ধান খেতের সবুজ চলল আমাদের হাত ধরে। পেরোলাম মাইলের পর মাইল আলুর খেত। গাঁয়ের বীথিপথ ধরে এগুনো হল। শীতের শুকনো ঝরাপাতাদের পেছনে ফেলে রেখে চললাম কোকিলের ডাক শুনতে শুনতে। ইউক্যালিপটাস, সোনাঝুরি, কদম, সেগুন আর বাঁশ ঝাড়ের সারি। সেদিন ছিল হজরত মহম্মদের জন্মদিন তাই স্থানীয় মসজিদে খুব রমরম করে ্সেই উতসব উদযাপন হচ্ছিল।এতক্ষণ পিচের রাস্তা ছিল। এবার কিছুটা কাঁচা রাস্তা। শুরু হয়ে গেল পরিত্যক্ত ভাঙা মন্দির। ইরিগেশন ক্যানালের ছোট্ট সেতু পেরিয়ে ইঁটভাটা পড়ল তার পর শুরু হল পিচের রাস্তা। ডান দিকে কাঁসাই নদী দেখা গেল আর বাঁদিকে এল সেই মন্দিরময় পাথরা গ্রাম।

আমরা সেই মন্দিরতলায় দাঁড়িয়ে ছবি তুলে চলেছি একে একে। তুলে শেষ করা যায় না এত মন্দির! ছোট মন্দির, বড় মন্দির, মন্দিরের ধ্বংস স্তূপ আর মন্দিরের সংলগ্ন গ্রাম, খেত খামার, ধানের গোলা, পুকুর কি নেই এখানে। যেন ভাবনার খোলাখাতা নিয়ে মন্দিরের সিঁড়িতে বসে পড়লে উঠে আসবে অনেক ইতিহাসের কথা। মোট চৌত্রিশটি মন্দির আছে এখানে।

নানান ধরণের, নানান গড়নের। এক একটির ভাস্কর্য এক এক রকম! তবে সবকটি মন্দিরই বাংলার ট্র্যাডিশানাল চালাঘরের আদতে বানানো হয়েছিল। মন্দিরময় পাথরা গ্রামটির মানুষজন যেন যুগযুগ ধরে

মন্দিরগুলিকে বুকে করে আগলে আসছে। মেদিনীপুর থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরে এই পাথরা গ্রাম। মন্দিরের গায়ের লেখা থেকে জানা গেল যে সেগুলি প্রায় ৫০০ বছরের পুরোণো। ১৭৩২ সালে বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁ, বিদ্যানন্দ ঘোষালকে রত্নাচক পরগণার রাজস্ব আদায়ের ভার দিয়েছিলেন ; বিদ্যানন্দ একের পর এক নিজের শখে ঐ জায়গাটিতে ৩৪ টি সুন্দর মন্দির বানিয়েছিলেন। নবাব এতে খুশি হন নি। তাকে বন্দীও করেন। পরবর্তীকালে পাথরা আর্কিওলজিকাল প্রিজারভেশান কমিটি, খড়্গপুর আইআইটির সাথে যৌথভাবে মন্দির গুলির তত্বাবধানের দায়িত্ব নেয়।

রয়েছে নাট মন্দির, কাছারিবাড়ি রাসমঞ্চ, নহবতখানা। বেশির ভাগই পরিত্যক্ত শিব মন্দির। শিবলিঙ্গও নেই কোনোটির মধ্যে। মন্দিরের গায়ের স্থাপত্য দেখবার মত। একটির গায়ে দশ অবতার, একটির গায়ে হনুমান। কোনোটির গায়ে নর্তক নর্তকীর অবয়ব, কোনটিতে আবার হলধারী বলরামের মূর্তি। পোড়ামাটির সব স্থাপত্য। মন্দির চত্বরে পড়ে রয়েছে মেটে আলুর ফল। ফুলে ফুলে সাদা সজনে ফুলের ডাল গা এলিয়ে পড়ে রয়েছে মন্দিরের গায়ে।

পাথরা গ্রাম দেখে আমরা এবার চললাম কর্ণগড়ের দিকে। মেদিনীপুর থেকে মাত্র দশ কিলোমিটার দূরে এই গ্রাম। এখানকার প্রাচীন গড় বা দুর্গটির কিছু ধ্বংসাবশেষ এখনো ভ্রমণপিপাসুদের আকৃষ্ট করবে। তবে পুরোণো গড়ের চত্বরে তৈরী হয়েছে নতুন মন্দির। দুর্গের দক্ষিণে আনন্দলিঙ্গ দন্ডেশ্বর মহাদেব এখনো আছেন আর তার পাশেই মহামায়া মন্দির।

কথিত আছে রঘুবাবা নামক এক ভক্ত এখানে ৩০-৩৫ বছর ছিলেন এবং তার মাহাত্ম্যেই কর্ণগড় এখনো স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। মহাভারতের রাজা কর্ণ নাকি এই দুর্গ বানিয়েছিলেন। "ভবিষ্য ব্রহ্মখন্ড" নামক সংস্কৃত পুঁথিতে কর্ণগড়ের অস্তিত্বের উল্লেখ আছে এবং মন্দিরগুলির আদল অনেকাংশেই ওড়িষ্যার মন্দিরের মত। কেউ বলেন কর্ণগড় তৈরী হয়েছিল ৫০০ বছর আগে এবং রাজা মহাবীর সিংহ এই দুর্গের প্রতিষ্ঠাতা। ব্রিটিশ আমলে "চুয়াড় বিদ্রোহে"র কারণে এটি ধ্বংস হয়ে যায়।১৭৬৭ সালে স্থানীয় আদিবাসী " চুয়াড়" দের এই বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল ঘাটশীলায়। এবং ১৭৯৮ সালে রাণি শিরোমণির নেতৃত্বে এই চুয়ার বিদ্রোহ মারাত্মক আকার ধারণ করে। এই আন্দোলনকে থামাতে ব্রিটিশ শাসকদেরও অত্যন্ত বেগ পেতে হয়েছিল। রাণীকে হত্যা করা হয়েছিল এবং তাঁকে "মেদিনীপুরের লক্ষ্মীবাঈ" সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিল। ঐতিহাসিক এই আন্দোলন ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে কিন্তু কর্ণগড় সাক্ষী হয়ে থাকে এই "চুয়াড় বিদ্রোহের" মূল ঘাঁটি রূপে।

এইভাবে সময়ের খেয়া বয়ে যায়। বয়ে যায় কত ঝড়। একজন সৃষ্টি করে আর কেউ তা ধ্বংস করে। পড়ে থাকে ধ্বংসের স্মৃতিচিহ্ন। মানুষ তার অদম্য ভ্রমণ-তৃষ্ণা নিয়ে ছুটে বেড়ায় আর নিয়ে আসে সেই স্মৃতিচিহ্নের কিছু অংশ। অজানা সব তথ্য উঠে আসে সেই পথের পাঁচালি থেকে। উত্সাহীর রঙ তুলির টানে সজীব হয়ে ওঠে পুরোণো সেই তৈলচিত্র, কিছু অদেখা মুহূর্ত্ত, কিছু অচেনা ইতিহাস। ভৌগলিক সীমা পেরিয়ে ইতিহাসের পাতায় সংযোজন হয় সেই সব না বলা কথারা।

লেখা ও ছবিঃ
ইন্দিরা মুখার্জী,
কলকাতা

গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে কিছুক্ষণ

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনা অঙ্গরাজ্যে অবস্থিত গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন একটা গিরিখাত - ৪৪৬ কিলোমিটার দীর্ঘ, ২৯ কিলোমিটার চওড়া, আর ১.৮৩ কিলোমিটার গভীর। কলোরাডো নদী আর তার শাখা নদীরা মিলে পাথর ক্ষয় করে করে এই গিরিখাতের সৃষ্টি করে।

ছোট বড় বিভিন্ন নদীদের ক্ষয় করবার ক্ষমতা বিভিন্ন বলে গোটা গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন জুড়ে নানারকমের শিলা স্তর দেখতে পাওয়া যায়, যেগুলি প্রায় ১৭ কোটি বছর আগে থেকে তৈরি হয়ে চলেছে।

গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ন্যাশ্‌নাল পার্ক আমেরিকার পর্যটকদের এক প্রধাণ আকর্ষন। প্রতি বছর প্রায় পাঁচ কোটি মানুষ এখানে বেড়াতে আসেন। প্রাকৃতিক দুর্গমতাকে উপেক্ষা করে ঘুরে বেড়ান পার্কের ভেতরে। অনেক সময়ে দুর্ঘটনা ঘটে, অনেক সময়ে অনেকে হারিয়েও যান। তখন পার্ক কর্তৃপক্ষ তাঁদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন।

বিশ্বের ভূবিজ্ঞানী এবং ভূতত্ত্ববিদ্‌দের কাছে নিরন্তর এক রহস্যের মত হল এই গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন। এখানে নদী এবং বায়ুর ক্ষয়কার্যের যতধরনের নমুনা এক সাথে দেখতে পাওয়া যায়, তা বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না।

এতটা বিস্তার বলেই, এই পুরো জায়গাটা জুড়ে আবহাওয়ার নানারকমের পরিবর্তন দেখা যায়। উঁচু জায়গাগুলো যখন শীতকালে বরফে ঢেকে যায়, নিচু জায়গাগুলোতে সেই সময়ে বৃষ্টি হয়। শীতকালে প্রচন্ড ঠাণ্ডা পড়ে, আর গ্রীষ্মকালে ভয়ানক গরম।

ইওরোপীয়দের আগমণের আগে, আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা এই অঞ্চলে বসবাস করত। তাদের মধ্যে পুয়েব্‌লো জাতির মানুষেরা এই জায়গাটিকে পবিত্র মনে করত। স্পেনের অভিযাত্রী গার্সিয়া লোপেজ দে কার্দেনাস ছিলেন প্রথম ইয়োরোপীয় যিনি ১৫৪০ সালে এইখানে আসেন।

বুঝতেই পারছ, ৪৪৬ কিলোমিটার একটা জায়গাকে তো আর একবারে ঘুরে দেখা সম্ভব নয়। এখানে প্রকাশ করা ছবিগুলিতে গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের মাত্র কিছু চেহারাই তুমি দেখতে পেলে। তাই আরো কতগুলি ছবি রইল তোমার জন্য।

তথ্য সংকলনঃ কাকলি পাল
ছবিঃ বোধায়ন চক্রবর্তী
এঙ্গেলউড, ডেনভার, কলোরাডো

অনুলিখনঃ মহাশ্বেতা রায়

পরশমণি: গরম ঠান্ডা নিয়ে দু'চার কথা

কেমন আছ তুমি? গরম কাল তো এশে গেছে, কিন্তু এইবার গরম চলে যাওয়ার আগে হটাত করে আবার ঠাণ্ডা ফিরে এসেছিল। আর এখনও, প্রায়শঃই কালবৈশাখী হচ্ছে বলে মাঝে মাঝেই বেশ গরম কমে যাচ্ছে, তাই না?

আজ এই গরম ঠান্ডা নিয়েই একটু বলি।

ক'দিন পরেই তো বিকেলে খেলা ধুলো করে দৌড়ে এসেই ফ্রিজ খুলে ঠান্ডা জল ঢক ঢক করে বোতল থেকেই গলায় ঢালবে।

খুব তেষ্টা পায় কিনা এই সময়টা!

এরকম ঠান্ডা জল খাওয়াটা কিন্ত মোটেই ভাল না। কেন, জানতে চাও? মাকে জিজ্ঞেস কর।

আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন ত' সবার বাড়িতে এখনকার মত ফ্রিজ ছিল না, আমাদের বাড়িতেও ছিল না। কিন্তু খেলা ধুলো করে এসে তাহলে আমরা কি ঠান্ডা জল পেতাম না? খুব পেতাম! কিন্তু কি করে বলত? সাধারনত তখন দৌড়তাম টিউবওয়েল বা নলকূপের দিকে, পেট পুরে ঠান্ডা জল খেতাম। কিন্তু সেটা না থাকলে কি হত বল দেখি?

গরম কালে সব বাড়িতেই থাকত মাটির কুঁজো। এতে জল রাখলে কিছুক্ষণের মধ্যেই জল খুব ঠান্ডা হয়ে যেত।

এখনও, যেখানে বিদ্যুত আসে নি, ফ্রিজ চলে না (বা যাদের বাড়িতে ফ্রিজ নেই)-- সেখানে কুঁজোর জলই ত ভরসা। সবাই তো ওই জলই খায়।

যারা কুঁজোর কথা জান না তারা 'মাটির' কুঁজোর নাম শুনে নাক শিঁটকচ্ছো নাকি? কিন্তু এটা কি জান যে আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই এরকম মাটির পাত্রে রাখা জলই খায়।

কিন্তু মাটির পাত্রে রাখা জল ঠান্ডা হয় কি করে। সেই কথাটাই বলব এখন।

এর আগে কোন সময় বলেছিলাম যে আমাদের শরীর থেকে ঘাম বেরিয়ে যাবার সময় সঙ্গে করে তাপ নিয়ে যায়, মনে আছে কি? নেই? ঠিক আছে, আবার বলছি।

যখন খুব গরম পড়ে, তখন আমাদের খুব অস্বস্তি হয়। কারণ আমাদের শরীরের বাইরের তাপমাত্রা তখন বেশী থাকে আর সেই তাপ আমাদের শরীর ঢুকে পড়তে চায়। কেন বল দেখি?

এটাও আগে বলেছি। সেটা হল তাপ সব সময় বেশী তাপমাত্রা থেকে কম তাপমাত্রার দিকে যেতে চায়।

কিন্তু প্রকৃতি দেবী আমাদের এই শারীরিক আস্বস্তি কাটাবার খুব সুন্দর ব্যাবস্থা করে দিয়েছেন। গরম গা-সওয়া না হলেই ঘাম হতে শুরু হয়, যত গরম পড়ে ঘামও তত বাড়ে। শরীরের বাইরে এসে ঐ ঘাম বাষ্প হয়ে বাতাসে মিশে যায়। কিন্তু বাষ্প হওয়ার জন্য যে তাপ চাই সেটা আসে কোত্থেকে? আমাদের শরীর থেকে ছাড়া আর কোথা থেকেই বা আসবে! ব্যস!আমাদের গরম শরীরও আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হতে চাইলে যেখানে হাওয়া আছে সেখানে, আর না হয় পাখার তলায় বসতে হবে!

পাখার তলায় বসলে গা জুড়োয় এটা ত আমরা সবাই জানি। আর খেলা ধুলার শেষে মাঠে বসে হাওয়া খেতে কেমন মজা সেটাও ত জানাই আছে! তাই কিনা, বল? আমাদের গায়ের চামড়ায় প্রচুর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। ঐ পথে শরীর থেকে ঘাম বার হয়। এই ছিদ্রগুলোর নাম হল 'লোমকূপ'। এটা বোধ হয় জান। ঐ সব পথ যাতে বন্ধ না হয় তার দিকে খেয়াল রাখা দরকার।বেশী প্রসাধনের জিনিষ ব্যবহার না করাই ভাল। এই সব বেশী ব্যবহার করে লোমকূপগুলো বন্ধ করে দাও যদি, তাহলে ঘাম কি করে শরীরের বাইরে আসবে আর আমরা ঠান্ডাই বা হব কি করে!

কোন কোন প্রাণীর শরীরে লোমকূপ নেই। এমন প্রাণী কোনটা হতে পারে বল দেখি! কুকুর এমন একটা প্রাণী। এদের শরীর লোমকূপ বিহীন। তাহলে এরা ঠান্ডা হয় কি করে? লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে গরম কালে এরা জিভ বার করে হাঁপাতে থাকে। জিভের লালা বাষ্প হয়ে উড়ে যাবার সময় শরীর থেকে তাপ নিয়ে চলে যায় আর এতে শরীর ঠান্ডা হয়।

কিন্তু আমরা ত কুঁজোর কথা বলছিলাম। এবার তার কথা বলি। কুঁজো তৈরী হয় মাটি দিয়ে। বেলে মাটি হলে আরও ভাল হয়। এই কুঁজোর গায়ে খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে অসংখ্য। এতে জল রাখলে ঐ সব ছিদ্র পথে জল বাইরে বেরিয়ে আসে। খালি কুঁজোয় জল রাখলে যে জল বেরিয়ে আসে সেটা একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবে। কুঁজোর বাইরের দিকটা ভিজে যায় ভেতরে জল থাকলে। এখন ওই জল বাইরে এসেই বাষ্প হওয়ার ফিকির খোঁজে। এবং শেষ পর্যন্ত বাষ্প হয় উবে যেতে থাকে। এতে কি হয় বুঝতেই পারছ। ঠিক আমাদের শরীরের যেমন হয় ঠিক তেমনই হয় এক্ষেত্রেও। বাইরের জল বাষ্প হওয়ার সময় ভেতরের জল থেকে তাপ সংগ্রহ করে বা তাপ শোষন করে। ফলে কুঁজোর জল ক্রমশঃ ঠান্ডা হতে থাকে আর শেষ পর্যন্ত বেশ ভাল মত ঠান্ডা হয়ে যায়।

এই জল খেলে ফ্রিজের জল আর ভাল লাগবে না, এটা হলফ করে বলতে পারি।

এই ধরনের তাপকে বলে 'লীনতাপ', মানে লুকিয়ে থাকা তাপ। লীনতাপের অনেক উদাহরণ আছে যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দেখতে পাই।

বড় হয়ে যখন উঁচু শ্রেণীতে পড়বে তখন এ বিষয়ে আরও অনেক কিছু জানতে পারবে।

আর একটা কথা বলি। ফ্রিজের জল যে ঠান্ডা হয়, তার সাথে কিন্তু এই লীনতাপের কোনও সম্পর্ক নেই।

পেতল বা কাঁসার কলসীতে জল রাখলে কিন্তু মোটেই ঠান্ডা হবে না। কেন বল দেখি! কি করে হবে, ওদের গায়ে ত ছোট বা বড়-- কোনও ছিদ্রই নেই। ধাতু নিরেট হয় কিনা।

সুতরাং জল বাইরে আসবেই বা কি করে, আর ঠান্ডাই বা হবে কিভাবে!

সন্তোষ কুমার রায়
কোদালিয়া
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

জানা-অজানা: গের

এই যে বন্ধু, তোমাকে আজ আমি কয়েকটা প্রশ্ন করবো .... দেখি তো তুমি উত্তর দিতে পারো কিনা...

১. বলো তো কোন দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা কেবল মাত্র একটি শহরে বাস করে?
২. কোন দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা তাঁবুতে থাকে?
৩. কোন দেশের রাজধানীকে পৃথিবীর সবচেয়ে ঠান্ডা রাজধানী বলা হয়?

কি বললে, জানো না?

আচ্ছা, তাহলে আমিই নাহয় বলে দিচ্ছি। সেই দেশটার নাম হলো মঙ্গোলিয়া। চীন আর রাশিয়ার মাঝে অবস্থিত এই দেশটি এক সময় চেঙ্গিজ খানের রাজ্যের রাজধানী ছিলো। প্রায় ৭০ বছর রাশিয়ার অধীনে থাকার পর ১৯৯০ সালে মঙ্গোলিয়া স্বাধীনতা লাভ করেছিলো।

বহু যুগ আগে থেকেই এই দেশের বাসিন্দারা যাযাবর জীবনে অভ্যস্ত। এখনো এই দেশের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা তাঁবুতে বাস করে। এদের মূল ব্যবসা হচ্ছে পশুপালন। তাছাড়াও এরা ছাগল, ভেড়া বা উটের লোম থেকে উল তৈরী করে। এই দেশের এক বিখ্যাত দ্রব্য হচ্ছে কাশ্মির উল যা এখানকার কাশ্মির ছাগলের লোম থেকে তৈরী হয়। আমাদের দেশে এই উল্‌কে পশমিনা উল বলা হয়।
কিন্তু আজ আমি তোমাদের এই দেশের প্রধান বাসার কথা বলতে চাই। যেহেতু এই দেশের বেশিরভাগ লোক যাযাবর জীবনযাপন করে, সেহেতু তারা পাকা বাড়ি ঘরে না থেকে, এক বিশেষ ধরনের তাঁবুতে থাকে। এই তাঁবু কে এরা গের বলে। এটাই এদের ড্রইং রুম, এটাই বেডরুম, আবার এটাই এদের রান্নাঘর। সব কিছুই এই তাঁবুর ভেতরে।

এই ধরনের তাঁবু মঙ্গোলিয়ার সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। এই গোলাকার তাঁবুগুলি সাদা বা ছাই রঙের মোটা উলের কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকে। প্রত্যেকটি পরিবারের একটি বা দু-তিনটে গের থাকে। এই তাঁবু গুলি লাগানো খুব সহজ। একটি তাঁবু লাগাতে প্রায় দু ঘন্টা সময় লাগে। আর খুলতে এক ঘন্টা। আমি তোমাকে বোঝানোর জন্য বেশ কয়েকটি ছবি দিলাম এখানে।

তাঁবুর দেয়ালটা কাঠের ঝাঁঝরি/জাল দিয়ে তৈরি। মাঝখানে একটি গোলাকার বলয় থাকে যা দুটো শক্ত-পোক্ত কাঠের ওপর লাগানো হয়।

চারপাশের কাঠের জাল আর মাঝের বলয়ের মাঝে থাকে অনেকগুলো লম্বা লম্বা কাঠের ডান্ডা। তোমরা সাইকেলের চাকা দেখেছ তো। সাইকেলের চাকায় যেমন ভাবে স্পোক গুলো সাজানো থাকে, মোটামুটি ঐরকম ভাবে সাজানো থাকে এই ডান্ডা গুলো। তাঁবুর দরজা সব সময় দক্ষিন দিকে থাকে।

একবার এই ফ্রেম টি তৈরি হয়ে গেলে, তারপর এর ওপর মোটা উলের কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এই সব কিছুই মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয় যাতে বাতাসে উড়ে না যায়।

শীতকালে এখানে তাপমাত্রা -৪০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এর নিচে চলে যেতে পারে। তাই শীতের সময় আরও বেশি উলের কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় যাতে তাঁবুর ভেতরটা গরম থাকে। গরমকালে তাঁবুর নীচের দিকের কাপড়গুলো উল্টে ওপরে উঠিয়ে দেওয়া হয় যাতে ভেতরে হাওয়া আসতে পারে।

তাঁবু গুলোকে গরম রাখার জন্য, তাঁবুর মাঝামাঝি জায়গায় একটি করে লোহার চুল্লি রাখা হয়। এতে কাঠের টুকরো, গোবর বা কয়লা জ্বালানো হয় যাতে এটি গরম হয়ে যায় আর তাঁবুকে গরম রাখে। তাঁবুর ভেতরে যাতে ধুঁয়ো না হয় তার জন্য এই চুল্লির ওপরে একটি লোহার পাইপ ফিট করা থাকে

যাতে কাঠের ধুঁয়ো তাঁবুর বাইরে চলে যায়।

তাঁবুতে কোন জিনিষটা কোথায় থাকবে তার একটি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। তাঁবুতে কোনো অতিথি এলে তাকে তাঁবুর বাঁদিকে বসানো হয়। গুরুত্বপূর্ণ অতিথিদের তাঁবুর ভেতরের দিকে আর অন্যদের দরজার কাছে বসানো হয়। পরিবারের লোকেরা তাঁবুর ডানদিকে বসে। রান্নাঘরের জিনিসপত্র ডানদিকে রাখা হয়। পূজোর স্থান দরজার ঠিক উল্টো দিকে। বিছানা দরজার বাম এবং ডান দিকে রাখা হয়।

আজকাল অনেক গেরে আধুনিক সুবিধে সম্পন্ন জিনিসপত্র রাখা থাকে। যেমন কি সোলার পাওয়ার প্যানেল, টিভি, ফ্রিজ, অ্যান্টেনা, ওয়াশিং মেশিন, ইত্যাদি।

এই ধরণের তাঁবুতে থাকার সুবিধে হচ্ছে যে যখন ইচ্ছে, যেখানে ইচ্ছে যাওয়া যায়। শীতকালে এরা ছোট ছোট পাহাড়ে ঘেরা জায়গায় তাঁবু পেতে থাকে। আবার গরমকালে তাঁবু গুটিয়ে, ঘোড়াগাড়ী করে পাহাড়ি অঞ্চল ছেড়ে সমতল ভূমিতে চলে আসে যাতে পশুরা (ঘোড়া, উট, ভেড়া, ছাগল, গরু) ঘাস খেতে পায়।

লেখা ও ছবিঃ
ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য
উলান বাটর, মঙ্গোলিয়া

<u>এক্কা-দোক্কা</u>

বিশ্বজয়ী ভারত

কিছুদিন আগেই শেষ হল ক্রিকেট বিশ্বকাপ। নিজের দেশে প্রথমবার আর এই নিয়ে দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ জিতল ভারত। একবার তার শুরুর আর শেষের মুহূর্ত দুটো মনে কর তো! প্রথম বলে ভারতের সাথে বাংলাদেশের খেলায় বীরেন্দ্র সেহওয়াগের বাউন্ডারি আর শেষ বলে শ্রীলঙ্কার সাথে ফাইনালে মহেন্দ্র সিং ধোনীর ওভার বাউন্ডারি। সেদিক দিয়ে দেখলে ভারতের শুরু আর শেষ দুটোই হয়েছে খুব ভালভাবে। বিশ্বকাপ জেতার আনন্দ, সেটাও আবার পরপর অনেকগুলো কঠিন ম্যাচ জিতে। তুমিও নিশ্চয়ই তোমার বাড়ির আর পাড়ার বাকিদের সাথে সাথে খুব মেতে উঠেছিলে ঐ দেড় মাস ধরে আর তারপর পুরোপুরি উপভোগ করেছ জেতার আনন্দ।

এবারের জেতাটাও আসলে ১৯৮৩ সালের সেই প্রথম বিশ্বকাপ জেতার থেকে অনেকটা আলাদা। তোমার তো তখন জন্মও হয়নি, আর আমিও এতটাই ছোট যে খেলা বোঝা তো দূরের কথা, কি নিয়ে আনন্দ করছে সবাই সেটাও বোঝার মত বোধ হয়নি। পরে অবশ্য তা নিয়ে অনেক গল্প পড়েছি। তখন তো আর সবার বাড়িতে টেলিভিশন ছিল না। তাই অনেকেরই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে হত রেডিও শুনে আর সংবাদপত্রের খেলার পাতা পড়ে। সেই ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপে ভারতকে কেউ প্রায় ধর্তব্যের মধ্যেই আনেনি। সেই সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ব্যাটিং, বোলিং - সবদিক দিয়েই দুর্ধর্ষ দল। তাদেরই যে ফাইনালে হারিয়ে দেবে ভারত এটা অনেকটাই অপ্রত্যাশিত ছিল। সেইদিক দিয়ে ভেবে দেখলে এবারের জয়টা হয়তো অনেকেই আশা করেছিল। প্রথমতঃ, ঘরের মাঠে খেলা। আর উপরে অভিজ্ঞ আর তরুণ ক্রিকেটারদের মিলিয়ে এবারের ভারতের দলটাও অন্যতম শক্তিশালী দলগুলোর মধ্যে একটা ছিল।

এবারের প্রতিযোগিতার এক বড় চমক ছিল আয়ারল্যান্ড। এখনও অবধি আয়ারল্যান্ড টেস্ট খেলার যোগ্যতা অর্জন করেনি আর এই নিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য বিশ্বকাপের মত বড় আসরে নেমেছিল। সেই অপেক্ষাকৃত অজানা আর অপেক্ষাকৃত দুর্বল দল নিয়ে তারা শুধু যে নেদারল্যান্ডের সাথে জিতল তাই নয়, হারিয়ে দিল নিজেদের প্রতিবেশী আর বহুগুণ শক্তিশালী ইংল্যান্ডকেও তাদের গ্রুপ লীগের ম্যাচে। দক্ষিণ আফ্রিকাও এসেছিল খুব শক্তিশালী দল নিয়ে আর প্রতিযোগিতার অন্যতম ফেভারিট হিসেবেই। কিন্তু বরাবরের মত সব ভালভাবে চলতে চলতে তারা প্রথম নক্-আউট ম্যাচেই খানিকটা অপ্রত্যাশিতভাবে হেরে গেল নিউজিল্যান্ডের সাথে।

এইবারে ভারতের দলে যেমন ছিলেন শচীন তেন্ডুলকার, মহেন্দ্র সিং ধোনি, যুবরাজ সিং, বীরেন্দ্র সেহওয়াগ, জাহির খান, হরভজন সিং-এর মত অভিজ্ঞ খেলোয়াড়েরা, তার সাথে ছিলেন গৌতম গম্ভীর, সুরেশ রায়না আর বিরাট কোহলির মত তরুণেরা। গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচগুলোতে ভারতের ধারাবাহিকতা ছিল ভাল আর খারাপ মিশিয়ে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর বাংলাদেশের সাথে খেলায় জিতলেও একটুর জন্য টাই হল ইংল্যান্ডের সাথে আর কাছাকাছি গিয়েও হারতে হল দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে। কিন্তু এই দলটা অনেক ভাল খেলল নক্-আউট পর্যায়ে গিয়ে। আর কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল আর ফাইনালে পরপর অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান আর শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জেতা তো সত্যিই গর্বের বিষয়। এর মধ্যে অস্ত্রেলিয়া ছিল গত তিন বছরের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। যদিও তখনকার দলের তুলনায় তাদের এবারের দলের ধার ছিল অনেক কম, কিন্তু তাও যথেষ্ট লড়াই করেই জিততে হল ভারতকে। আর জিতেই সেমিফাইনালে মুখোমুখি পড়তে হল প্রতিবেশী আর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের।

ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচ মানেই চিরকাল টানটান উত্তেজনা আর তার উপর এটা আবার বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল। তাই ক্রিকেটপ্রেমী মানুষকেও কোনভাবে নিরাশ হতে হল না। প্রথম থেকে শেষ অবধি চলল হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। প্রথমে ব্যাট করে ভারত তাদের ইনিংস শেষ করল ২৬০ রানে। ভারতের সমর্থকরা হয়তো আরও খানিকটা বেশী রান আশা করেছিল - তাই রয়ে গেল একটা চাপা আশঙ্কা। যদিও শেষপর্যন্ত ভারতের বোলারেরা সকলেই খুব ভাল বোলিং করে পাকিস্তানকে অল-আউট করে দিলেন ২৩১ রানে।

২০০৩ সালের পর ৮ বছর পর আবার বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছল ভারত। সেবার ফাইনালে হারতে হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার সাথে। আর এবার মুখোমুখি শ্রীলঙ্কা। এই সেই শ্রীলঙ্কা যাদের কাছে ১৯৯৬ সালের বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে হেরে গিয়েছিল ভারত। এইবারের শ্রীলঙ্কা দলটাও, বিশেষতঃ তাদের ব্যাটিং ছিল খুবই শক্তিশালী। ২রা এপ্রিল মুম্বাই শহরের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে আয়োজিত হল ফাইনাল। তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ এই ফাইনাল ম্যাচ নিয়ে মানুষের আবেগ আর উত্তেজনা। পাড়ায় পাড়ায় ক্রিকেটারদের পোস্টার আর পতাকা তো ছিলই, তার সাথে বিভিন্ন মন্দিরে চলছিল ভারতের জেতার কামনায় মানুষের পূজা-প্রার্থনা।

ভারতের বোলারেরা ভাল বোলিং করে শ্রীলঙ্কাকে আটকে রাখলেন ২৭৪ রানে। রান হয়তো আর খানিকটা কম হতে পারত, কিন্তু শেষের দিকে দুর্ধর্ষ ব্যাটিং করে জয়বর্ধনের ৮৮ বলে অপরাজিত ১০৩ রানের সুবাদে ফাইনাল ম্যাচ ঝুলে রইল এক জমজমাট আর উত্তেজক সমাপ্তির জন্য। দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুটাও ভাল হল শ্রীলঙ্কার। ৩১ রানের মধ্যেই তারা আউট করল দুই বিপজ্জনক ওপেনার সেহওয়াগ আর তেন্ডুলকারকে। এরপর যখন শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপের হাতছানি পেতে শুরু

করেছে, সেই সময়েই খুব সাহসিকতা আর ঠান্ডা মাথায় ব্যাটিং করে শ্রীলঙ্কার সব আশায় জল ঢেলে দিলেন গম্ভীর, কোহলি, ধোনি আর যুবরাজ। এর মধ্যে গম্ভীর আর ধোনির নাম তো বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। গম্ভীর যদিও ৩ রানের জন্য ফাইনালে সেঞ্চুরির থেকে বঞ্চিত হলেন, কিন্তু ধোনি সত্যিকারের ক্যাপ্টেনের মত শেষ অবধি ৯১ রান করে ভারতকে এনে দিলেন দ্বিতীয়বারের জন্য বিশ্বকাপ। জয়ের শেষ রানটাও এল ধোনির ব্যাট থেকেই, লং-অনের উপর দিয়ে ওভার বাউন্ডারির মাধ্যমে।

জয়ের মূহুর্তে যুবরাজ সিংহ আর মহেন্দ্র সিং ধোনি

তারপরের কথা তো আর তোমাকে আলাদা করে বলার কিছু নেই। নিজেই দেখেছ কত মানুষ রাস্তায় নেমে জায়গায় জায়গায় জেতার আনন্দে মেতে উঠেছে। সেই সময়ে তুমিও কি স্থির হয়ে বসে থাকতে পেরেছিলে? কি করলে জেতার আনন্দে? ফাইনালের ম্যান-অফ্-দ্য-ম্যাচ হলেন ক্যাপ্টেন ধোনি আর প্রতিযোগিতার অনেকগুলো ম্যাচ ভাল খেলার সুবাদে ম্যান-অফ্-দ্য-টুর্নামেন্ট হলেন যুবরাজ সিং।

সহ খেলোয়াড়দের কাঁধে চেপে শচীন তেন্ডুলকর

তবে এই জয় মনে হয় সবচেয়ে স্মরণীয় হয়ে রইল শচীন তেন্ডুলকারের জন্য। ১৯৯২ থেকে শুরু করে

এই নিয়ে ষষ্ঠবারের জন্য টুর্নামেন্টে নেমেছিলেন। ২১ বছরের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটজীবনে প্রায় কোন সাফল্যই অধরা থেকে যায়নি। বাকি ছিল শুধু বিশ্বকাপ জেতা। তাই চেপে রাখতে পারলেন না জয়ের আবেগের অশ্রু। আর তাঁকে কাঁধে চাপিয়ে সারা মাঠ ঘুরে তাঁর সহ-খেলোয়াড়েরা দিলেন যথাযোগ্য সম্মান। সেইসাথে সকলের ধন্যবাদ কুড়োলেন কোচ গ্যারি কার্স্টেনও।

বড় হলেও দেখবে এই জেতার টুকরো স্মৃতিগুলো বহুদিন রয়ে যাবে তোমার মনে। আশা রাখি, আমাদের জীবনকালে আমরা আরও দেখব ভারতের বিশ্বকাপ জয়। কিন্তু নিজেদের দেখা এই প্রথমবারের আনন্দ চিরকাল গেঁথে থাকবে সুখস্মৃতি হয়ে।

লেখাঃ
পাভেল ঘোষ
হিলস্‌বোরো, ওরেগন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

ছবিঃ
ইন্টারনেট

ডার্বির হাল-হকিকত

ফুটবলে "ডার্বি ম্যাচ" কথাটা হয়তো তুমি শুনে থাকবে। যেমন ধরো, কিছুদিন আগেই তোমার বাড়ির কাছেই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে যখন ইষ্টবেঙ্গল - মোহনবাগানের মধ্যে খেলা হল তখন হয়তো অনেকের মুখে "কলকাতার ডার্বি" কথাটা শুনেছ। আসলে এক শহরের বা এক অঞ্চলের ফুটবল ক্লাবগুলো যখন নিজেদের মুখোমুখি হয়, তখন সেই খেলাগুলোকেই "ডার্বি ম্যাচ" বলা হয়। পারিপার্শ্বিকের আবেগ, খেলা জেতা-হারার আনন্দ আর দুঃখ মিলিয়ে এই খেলাগুলোর উত্তেজনা স্বভাবতই একটু বেশি থাকে অন্য খেলাগুলোর থেকে। অনেক সময় হয়তো দেখা যাবে যে বন্ধুদের মধ্যে বা একই বাড়িতে কেউ পাগল একটা দলের জন্য - আর অন্য কেউ অন্য দলের জন্য। আর তার থেকে আলোচনা, টানাপোড়েন আর হারার দুঃখ সব মিলিয়ে ডার্বি ম্যাচগুলো হয়ে ওঠে খেলার থেকে অনেক বেশি।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই সেখানকার ক্লাব ফুটবল লীগে কিছু কিছু ডার্বি ম্যাচ থাকে একই শহর বা একই অঞ্চলের দলগুলোর মধ্যে। যেহেতু বিশ্বের বেশীরভাগ দেশের বড় ফুটবলাররা ইউরোপের বিভিন্ন দেশের লীগে খেলে থাকেন, তাই আজ তোমাকে ইউরোপের এরকম কিছু ডার্বি ম্যাচ নিয়েই বলব। আর আজকাল তো স্যাটেলাইট টেলিভিশনের দৌলতে এই লীগগুলোর অনেকগুলোই তুমিও ইচ্ছা করলেই দেখতে পারবে।

প্রথমেই চলো কথা শুরু করি ফুটবলের জন্মভূমি ইংল্যান্ডের প্রিমিয়ার লীগ নিয়ে। পৃথিবীর সব লীগের মধ্যে প্রিমিয়ার লীগই হয়তো সবচেয়ে গতিশীল আর প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। লীগের কুড়িটা দলের মধ্যে লন্ডনের ক্লাবের ছড়াছড়ি। এদের নিজেদের মধ্যে খেলাগুলো পরিচিত "লন্ডন ডার্বি" নামে। তবে তার মধ্যে যে খেলাটায় রেষারেষি সবচেয়ে তুঙ্গে থাকে - সেটা হল নর্থ লন্ডনের দুটি ক্লাবের মধ্যে - আর্সেনাল আর টটেনহ্যাম হটস্পার। যদিও সাফল্যের দিক দিয়ে চিরকালই আর্সেনাল টটেনহ্যামের থেকে অনেকগুণ এগিয়ে, কিন্তু তার জন্য নিজেদের ডার্বির গুরুত্ব কোনভাবেই কম হয়না। যদিও প্রায় এক শতক ধরে নর্থ লন্ডনের ক্লাব হিসেবেই পরিচিত, কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে ক্লাবের গোড়াপত্তন হয়েছিল লন্ডনের দক্ষিণ-পূর্ব উলউইচ এলাকায়। তাই এক অংশের টটেনহ্যাম সমর্থকরা আর্সেনালকে নর্থ লন্ডনের

ক্লাব বলেই গণ্য করে না। তাদের মতে আর্সেনাল চিরকালই কোন না কোনভাবে টটেনহ্যামকে নকল করে এসেছে। অন্যদিকে, এর উত্তরে এক অংশের আর্সেনাল সমর্থকদের মতামত এটা শুধুমাত্র তাদের প্রতিবেশীদের আর্সেনালের সাফল্য দেখে হতাশার বহিঃপ্রকাশ। এরকমই আরেক রেষারেষির গল্প হল লিভারপুলের মার্সিসাইড অঞ্চলের দুটি ক্লাবের - লিভারপুল ফুটবল ক্লাব আর এভারটন। একই শহরের পাশাপাশি দুটি ক্লাবের জার্সির রঙের জন্য এদের অনেক সময় ডাকা হয় "রেড সাইড অফ্‌ মার্সিসাইড" আর "ব্লু সাইড অফ্‌ মার্সিসাইড" বলে। ইংল্যান্ডের ইতিহাসে লিভারপুলের সাফল্য তাদের সমর্থকদের কাছে যতটা গর্বের, সেটা ততটাই বেদনাদায়ক এভার্টন সমর্থকদের কাছে। যদি চট করে মানচিত্র বইটা একবার খুলে ফেল তাহলে এর কাছাকাছিই দেখবে ম্যাঞ্চেস্টার শহর, আর বৃহত্তর ম্যাঞ্চেস্টার অঞ্চলের দুটি ক্লাব - ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড আর ম্যাঞ্চেস্টার সিটি-র মধ্যে চলে "ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বি"। এখানেও দেখা যাবে যে চিরকালই ইউনাইটেড সাফল্যের দিক দিয়ে সিটি-র থেকে অনেক এগিয়ে। সাম্প্রতিককালে কার্লোস তেভেজ যখন দলবদল করে ইউনাইটেড থেকে সিটি-তে খেলা শুরু করলেন আর তার সাথে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি অনেক খরচ করে দল বানিয়ে ইউনাইটেড-এর পাল্লা দিতে শুরু করল, তার মধ্যেই ম্যাঞ্চেস্টার সিটির স্টেডিয়ামের সামনে বড় ব্যানারে তেভেজের ছবির সাথে "ওয়েলকাম টু ম্যাঞ্চেস্টার" লেখাটা অনেকটাই ইউনাইটেড-এর সমর্থকদের তাতিয়ে দেওয়ার জন্য। এ ছাড়াও রয়েছে ওয়েষ্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ন আর উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সের মধ্যে "ব্ল্যাক কান্ট্রি ডার্বি", সান্দারল্যান্ড আর নিউক্যাসল ইউনাইটেড-এর মধ্যে "টাইন অ্যান্ড উইয়ার ডার্বি", সাউদাম্পটন আর পোর্টস্মাউথের মধ্যে "সাউথ কোষ্ট ডার্বি", আরও কত কি!

নর্থ লন্ডন ডার্বিতে সমীর নাসরি আর লুকা মদ্রিচের বলের লড়াই

ঠিক পাশের দেশ স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো শহরের আরেকটি ডার্বি ম্যাচের কথা না বলে এই বিষয়ে কোন লেখাই হয়তো শেষ করা যাবে না। এই শহরের দুটি ক্লাব সেলটিক আর রেঞ্জার্সের মধ্যে হওয়া "ওল্ড ফার্ম ডার্বি" পৃথিবীর সবচেয়ে রেষারেষির ডার্বিগুলোর মধ্যে অন্যতম। স্কটিশ লীগের এই দুটি সবচেয়ে সফল ক্লাবের মধ্যে ফুটবল খেলা শুধু খেলা তো নয় - তার সাথে জড়িয়ে আছে বহু সামাজিক, ধর্মীয় আর রাজনৈতিক ইতিহাস। সেগুলো নিয়ে লিখতে বসলে হয়তো একটা আলাদা বই লিখে ফেলা যাবে।

ওল্ড ফার্ম ডার্বিতে সেলটিক আর রেঞ্জার্সের সমর্থকেরা

ইংল্যান্ড থেকে এবারে চলো যাই একটু দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের পাড়ে ইতালিতে। ইতালির সর্বোচ্চ পর্যায়ের লীগের নাম হল "সিরি এ"। এদেশে ফুটবল তো শুধুমাত্র আর খেলা নয়, মানুষের প্রতিদিনকার জীবনযাপনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তাই ফুটবল যেন এখানে জীবনযুদ্ধের একটা অংশ। সেটাই আরও প্রকট হয়ে ওঠে ডার্বি ম্যাচগুলোতে। দুর্ভাগ্যবশতঃ, অনেক সময়েই তার সাথে জড়িয়ে পড়ে সমর্থকদের মধ্যে নানা অপ্রীতিকর ঘটনা। প্রথমেই বলতে হয় মিলান শহরের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী এ. সি. মিলান আর ইন্টারন্যাজিওনেল (যা "ইন্টার মিলান" নামেই বেশী পরিচিত)-এর কথা। তুরিন শহরের জুভেন্টাস ক্লাবের পর সাফল্যের দিক দিয়ে মিলানের এই দুটি ক্লাবই ইতালিতে সবচেয়ে এগিয়ে। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী মিলান শহরের বিত্তবান আর উচ্চ মধ্যবিত্তরা ছিল ইন্টার-এর সমর্থক আর নিচুতলার খেটে খাওয়া মানুষেরা এ. সি. মিলানের সমর্থক। ক্লাবের সমর্থনের মধ্যে এই সামাজিক প্রতিফলন চিরকাল এই ডার্বি ম্যাচকে দিয়ে এসেছে এক অন্য মাত্রা। এর পরেই বলতে হয় মিলানের নিকটবর্তী তুরিন শহরের জুভেন্টাস আর তুরিনোর মধ্যে ডার্বি। জুভেন্টাস যদিও ইতালির লীগে সবচেয়ে বেশী সফল, আর সেদিক দিয়ে তুরিনো অনেকটা পিছিয়ে আর সাম্প্রতিককালে অনেক সময়েই সর্বোচ্চ স্তরে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি, কিন্তু এই ডার্বি যখন খেলা হয় তখন দুই দলই সবকিছু ভুলে নিজের শহরের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য খেলে থাকে। খানিকটা আশ্চর্যজনকভাবে তুরিন শহরের মধ্যে তুরিনোর সমর্থনের কখনও ঘাটতি হয়নি। যদিও জুভেন্টাসের সমর্থন তুরিনের বাইরেও ইতালির অন্যান্য শহর আর বিশ্বের অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে আছে। তার সাথে বলতে হয় ইতালির রাজধানী রোমের লাজিও আর এ. এস. রোমা (বা, সংক্ষেপে রোমা)-র মধ্যে ডার্বির কথা। উত্তরের মিলান আর তুরিন শহরের ক্লাবগুলোর মত সাফল্য এদের কারোরই নেই। তাই অনেক সময় লীগ জেতার থেকেও ডার্বি ম্যাচে জেতাটা বেশী প্রাধান্য পেয়ে থাকে, আর তার থেকেই এই ডার্বিও পেয়ে থাকে এক অন্য উত্তেজনা।

মিলান ডার্বিতে সমর্থকের লাগানো আগুনে স্টেডিয়ামের একাংশে আগুন জ্বলছে

ইতালি থেকে এবারে দেখে আসি চলো ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিমে স্পেন-এ। এই দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের লীগ "লা লীগা"-তে হয়তো তুমি দেখতে পাবে না ইংলিশ প্রীমিয়ার লীগের গতি, হয়তো দেখবে না সিরি এ-র জমাট রক্ষণ, কিন্তু হয়তো দেখতে পাবে আকর্ষণীয় দৃষ্টিনন্দন ফুটবল। আসলে ফুটবল এখানে শুধু একটা খেলা নয়, এদের সংস্কৃতির একটা অংশ। আর তাই স্পেনের মানুষের বর্ণময় জীবনযাত্রার সাথে সাথে এদের ফুটবলও খুব বর্ণময়। সেই লা লীগা-র সবচেয়ে দুটি সফল ক্লাব হল মাদ্রিদ শহরের রিয়াল মাদ্রিদ আর বার্সেলোনা শহরের বার্সেলোনা ফুটবল ক্লাব। এদের নিজেদের মধ্যে যে খেলা হয় সেটা বিখ্যাত "এল ক্লাসিকো" বলে, যার ইংরেজী অনুবাদ করলে হয় "দ্য ক্লাসিক"। ডার্বির সংজ্ঞা অনুযায়ী এটাকে ঠিক ডার্বি না বলা গেলেও, এটা নিঃসন্দেহে স্পেনের দুটি সবচেয়ে বড় শহরের দুটি সবচেয়ে বড় ক্লাবের নিজেদের মধ্যে সন্মানের লড়াই। যদিও রিয়াল মাদ্রিদের আসল ডার্বি হল নিজেদের শহরের অন্য ক্লাব অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের সাথে। রিয়াল মাদ্রিদ চিরকালই গণ্য হয়েছে মাদ্রিদ শহরের অভিজাত আর উচ্চ মধ্যবিত্তদের একটা প্রতীক হিসেবে, সেখানে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ তাদের সাথে পাল্লা দিয়েছে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের সমর্থন নিয়ে। যদিও সত্তর আর আশির দশকের একটা সময় ছাড়া অ্যাটলেটিকোকে সাফল্যের দিক দিয়ে চিরকালই রিয়ালের ছত্রছায়ায় থাকতে হয়েছে, কিন্তু তার জন্য "মাদ্রিদ ডার্বির" আকর্ষণ আর উত্তেজনা কোন অংশে ক্ষুণ্ণ হয়নি। কিন্তু লা লীগা-র সবচেয়ে বড় ডার্বি হল দুটি মাঝের সারির ক্লাব সেভিয়া আর রিয়াল বেটিসের মধ্যে। সেভিয়ে অঞ্চলের দুটি ক্লাবের এই ডার্বিকে বলা হয় "সেভিয়ে ডার্বি"। সাম্প্রতিককালে অবশ্য রিয়াল বেটিস নীচের সারিতে নেমে যাওয়ার জন্য এই ডার্বি আয়োজিত হতে পারেনি। তেমনই রয়েছে বার্সেলোনার স্থানীয় ডার্বি এসপ্যানিয়লের সাথে, ভ্যালেন্সিয়া অঞ্চলের ভ্যালেন্সিয়া ফুটবল ক্লাব, ভিয়ারিয়াল আর লেভান্তের ডার্বি।

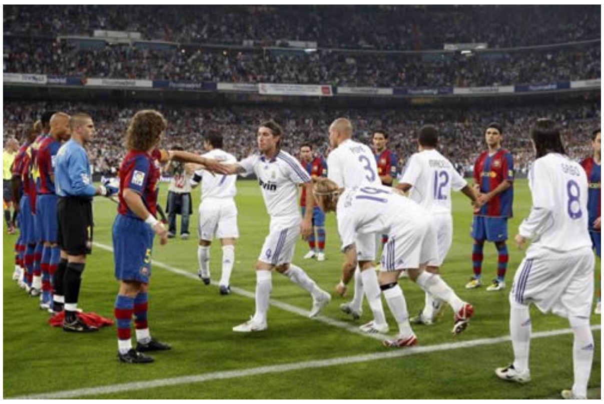

এল ক্লাসিকো শুরুর মুহূর্তে বার্সেলোনা আর রিয়াল মাদ্রিদের ফুটবলারদের একে অপরকে অভিবাদন

জার্মানীর বুন্দেশলিগাতে একই শহরের ক্লাবগুলোর মধ্যে ডার্বি সচরাচর দেখা না যাওয়ার কারণ হয়তো বেশীরভাগ সময়েই একই শহরের ক্লাবগুলো একই পর্যায়ে না খেলার জন্য। সেই জন্য এখানে মুখ্যতঃ দেখা যায় আঞ্চলিক ডার্বি। যেমন উত্তর জার্মানীতে আছে হ্যামবার্গার আর ওয়ের্ডার ব্রেমেন-এর ডার্বি। তা ছাড়াও হ্যামবার্গার আর সেইন্ট পাউলির মধ্যে ডার্বিও খুব জমজমাট। অনেককাল থেকেই সেইন্ট পাউলির সাথে বিভিন্নভাবে স্কটল্যান্ডের রেঞ্জার্স ক্লাবের একটা সখ্যভাব ছিল। যার জন্য রেঞ্জার্সের চিরশত্রু সেলটিকের সাথে হ্যামবার্গারের বহুদিনের একটা বন্ধুত্ব তৈরী হয়েছে।

এরকম বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন লীগে ছড়িয়ে আছে আরো অনেক ডার্বি। তার সাথে জড়িয়ে আছে তাই

নিয়ে মানুষের আবেগ, আর আনন্দ-দুঃখের গল্প। তাই এরপর যখন খেলা দেখতে বসবে তখন এই খেলাগুলোর দিকে একটু বিশেষভাবে নজর রেখো, আর কোথাও এই নিয়ে পড়ার সুযোগ পেলে একদম হাতছাড়া কোরোনা। দেখবে জানতে পারবে আরো কত কিছু। আর এরপর যখন বাড়িতে বা পাড়ায় বড় দাদারা এইসব ফুটবলের ডার্বি নিয়ে আলোচনা করবে, তখন তুমিও তার মধ্যে অংশ নিয়ে সবাইকে অবাক করে করে দিতে পারবে।

লেখাঃ
পাভেল ঘোষ
হিলস্‌বোরো, ওরেগন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

ছবিঃ
ইন্টারনেট

আঁকিবুকি

দেবারুণ দেব
চতুর্থ শ্রেণী, এপিজে স্কুল, সল্ট লেক, কলকাতা

মধুরিমা গোস্বামী
সপ্তম শ্রেণী, ওয়েল্যান্ড গোল্ডস্মিথ স্কুল, পাটুলি, কলকাতা

নীলাগ্নি দাস
দ্বিতীয় শ্রেণী,আর্মি পাবলিক স্কুল, গুয়াহাটি

প্রতীক চক্রবর্তী
তৃতীয় শ্রেণী, ওয়েল্যান্ড গোল্ডস্মিথ স্কুল,পাটুলি, কলকাতা

ঋক ঘোষ
চতুর্থ শ্রেণী, বি ডি মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট, কলকাতা

সৃজনী ঘোষ
পঞ্চম শ্রেণী, বি ডি মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট, কলকাতা

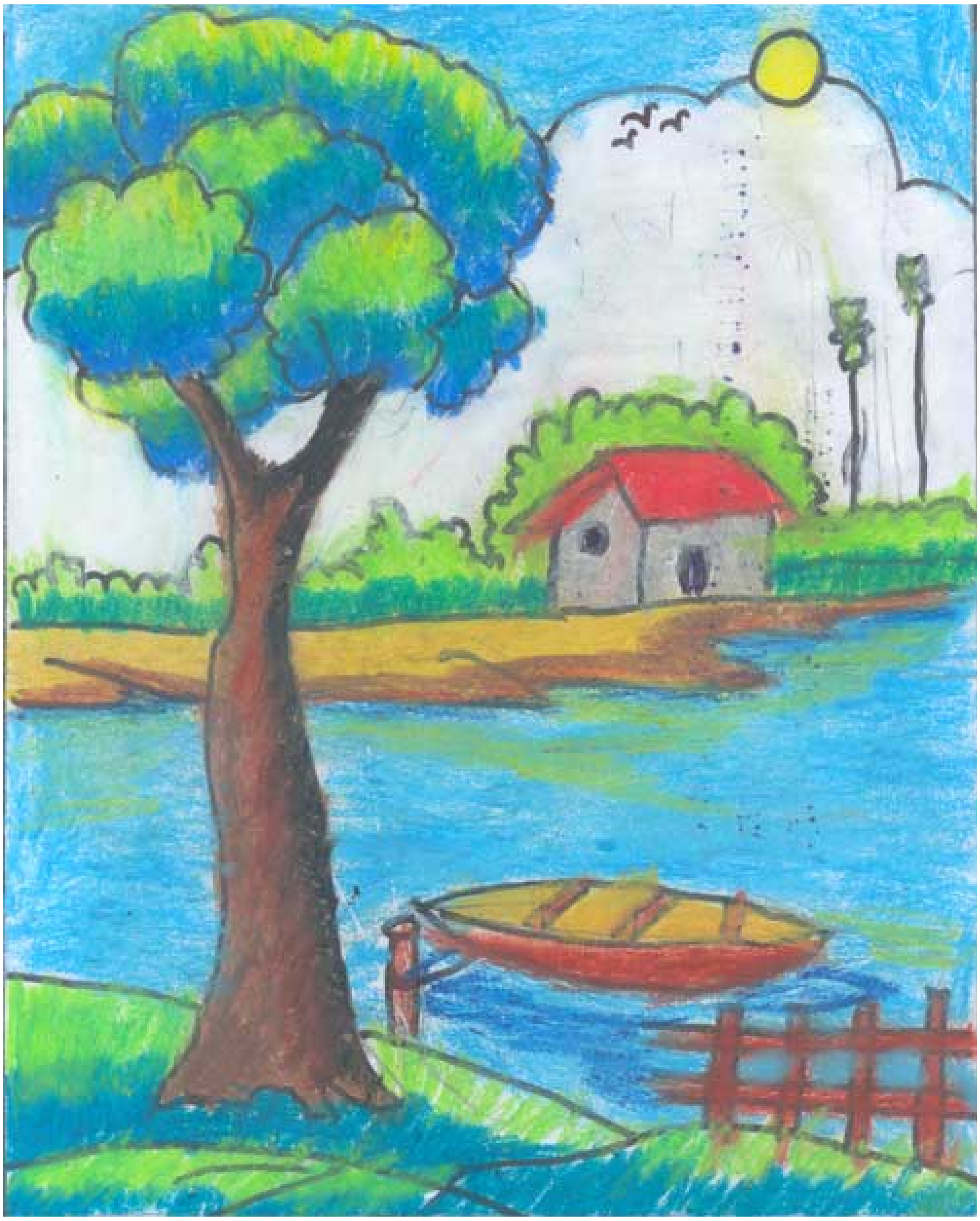

শুভম গোস্বামী
তৃতীয় শ্রেণী, ওয়েল্যান্ড গোল্ডস্মিথ স্কুল, পাটুলি, কলকাতা

ঊর্বী মুখার্জি
তৃতীয় শ্রেণী, ক্যালকাটা পাবলিক স্কুল

তুমিও কি চাও তোমার আঁকা ছবি ইচ্ছামতীকে পাঠাতে? তাহলে তোমার আঁকা ছবি স্ক্যান করে অথবা ডিজিটাল ফোটোগ্রাফি করে পাঠিয়ে দাও ইচ্ছামতীর মেইল ঠিকানায়।